এক নজরে ইসলাম

ডঃ রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী

এক নজরে ইসলাম

ডঃ রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী

সেভ ইন্ডিয়া মিশন
বিই-৩০০, সল্টলেক সিটি
কলকাতা-৬৪

অনুসন্ধানীর চোখে দেখুন —

সত্যি কি আপনি ইসলাম সম্বন্ধে কিছু জানতে চান? এই বিশ্বে ইসলাম কিভাবে প্রচার হল। ইসলাম কি সত্যিই শান্তশিষ্ট মহানতা প্রচার করতে চায়, ইসলাম মানে কি শান্তি? মক্কা থেকে ভারত পর্যন্ত প্রায় ৫০টি মুসলিম দেশ কিভাবে দখল করল, ইসলামের লোলুপ শান্তিরবাণী প্রচার দ্বারা,—না অন্যভাবে সেটা ভারতের ঘটনা থেকে কিছুটা অনুমান করুন? কেমন ইসলাম শান্তি, পাঠক ভাবুন?

ইতি—লেখক

প্রকাশক
সেভ ইন্ডিয়া মিশন
প্রথম প্রকাশ ঃ শুভ দীপাবলি, ১৪১২ (১লা নভেম্বর, ২০০৫)
দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ২ মে, ২০১০
তৃতীয় সংস্করণ ঃ ২০১৪

মূল্য ঃ ৪০ (চল্লিশ) টাকা

মুদ্রণে
সুবোধ প্রেস, ৬, ডালিমতলা লেন, কলকাতা-৬

প্রাপ্তিস্থান
তুহিনা প্রকাশনী, ১২সি, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩

প্রকাশকের নিবেদন

৫ই জুলাই ২০০৫ ও ৭ই জুলাই ২০০৫ তারিখে যথাক্রমে অযোধ্যার রামজন্মভূমি ও লন্ডন শহরের মেট্রো বা টিউব রেল কামরার উপর ইসলামী সন্ত্রাসবাদীদের হামলার ঘটনায় সবাই হকচকিত কিন্তু সন্ত্রাসবাদের প্রেরণার উৎস ইসলামের মোকাবিলা কিভাবে করা যাবে সে সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করতে রাষ্ট্রনেতারা দ্বিধাগ্রস্ত। ২০০১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার বিধ্বস্ত হবার পর সে সম্বন্ধে জনৈক মার্কিন বিশেষজ্ঞ—নাম Craig Winn—একটি বিশ্লেষণাত্মক গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। গ্রন্থের শীর্ষক হচ্ছে 'Prophet of Doom'। উনি আর একখানি গ্রন্থ লিখেছেন—নাম দিয়েছেন 'Tea with Terrorists'। ৭০০ পাতা ও ৪০০ পাতার বই দুটিতে Craig Winn অকাট্যভাবে প্রমাণিত করেছেন যে, ইসলাম উৎপাটিত না হওয়া পর্যন্ত সন্ত্রাসবাদ উন্মূলিত হবে না। জনৈক ভারতীয় মনীষী (প্রয়াত শ্রীসীতারাম গোয়েল) মন্তব্য করেছেন যে, কোরানের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব সম্পর্কে অমুসলমান বা কাফেরদের অজ্ঞতাই হচ্ছে আল্লার শক্তি। কোরানের ইসলাম তত্ত্ব সম্বন্ধে অমুসলমানদের জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আল্লার শক্তির হ্রাস ঘটবে। রাস্তাঘাটে পড়ে গিয়ে রক্তক্ষয় হলে আমরা Tet-vac Injection নিই গুরুতর ব্যাধির প্রতিষেধক হিসেবে। বিজ্ঞান সাধক রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারীর লেখা "এক নজরে ইসলাম" বইটি পাঠককে কোরান-হাদিশ নিহিত ইসলাম সম্বন্ধে সচেতন করে দিয়ে সেই টেট-ভ্যাক ইনজেকশানের কাজ করবে। ভারতীয় হিন্দু সমাজ ইসলামী আগ্রাসন থেকে সহজেই রক্ষা পাবে কেননা কথায় বলে To be fore-warned is to be fore-armed। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে এই বইটির বহুল প্রচলন বাঞ্ছনীয়। অলমতিবিস্তরেণ।

কলকাতা — অমিতাভ ঘোষ

রথযাত্রা

১৪১২ (৮ই জুলাই, ২০০৫)

সূচী

অবতরণিকা

আজ থেকে বছর তিনেক আগে আমেরিকার মাটিতে ঘটে গিয়েছে ইসলামী সন্ত্রাসবাদের সর্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর আক্রমণ। বিগত ২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর ওসামা বিন লাদেনের সন্ত্রাসবাদী দল আলকায়েদা আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরের ওয়ার্লডি ট্রেড সেন্টার নামে দুখানা আকাশচুম্বী বহুতল ইমারৎ ধূলায় মিশিয়ে দেয়। মোট ১৯ জন মুসলমান জেহাদী এই কাজে লিপ্ত ছিল, যার মধ্যে ১৭ জন ছিল সৌদি আরবের নাগরিক। তারা ৪ খানা জেট বিমান ছিনতাই করে এবং তার মধ্যে দুটো বিমান দিয়ে তারা ওয়ার্লড ট্রেড সেন্টারের বাড়ি দুটোকে আঘাত করে। তৃতীয় বিমানটির সাহায্যে তারা আমেরিকার কেন্দ্রীয় সামরিক কার্যালয় পেন্টাগনকে আঘাত করে। চতুর্থ বিমানটিকে তারা আমেরিকার রাষ্ট্রপতির সরকারি বাসস্থান হোয়াইট হাউসকে আঘাত করার পরিকল্পনা করেছিল। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছায় হোয়াইট হাউসকে আঘাত করার আগেই বিমানটি একটা জঙ্গলের মধ্যে ভেঙে পড়ে।

যাই হোক, উপরিউক্ত ঘটনার পরে আরও অনেক ঘটনা ইতিমধ্যে ঘটে গিয়েছে। যেমন আমেরিকার আফগানিস্তান আক্রমণ ও সেখানকার তালিবান সরকারের পতন। মুসলমান সন্ত্রাসবাদীদের দ্বারা দিল্লীর সংসদ ভবন ও কলকাতার আমেরিকান সেন্টার আক্রমণ। গোধরায় ৫৯ জন রামসেবককে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার মত অত্যন্ত দুঃখবহ ঘটনা। আমেরিকার ইরাক আক্রমণ ও সাদ্দাম সরকারের পতন ঘটানো এবং বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর মুসলমান নামে পরিচিত জলাতঙ্কগ্রস্ত কুকুরদের জঘন্য আক্রমণ ও নৃশংস অত্যাচার।

মুসলমানদের এই সব বর্বর কার্যকলাপ সমস্ত পৃথিবীর আলোকপ্রাপ্ত মানুষকেই ইসলাম সম্বন্ধে কৌতূহলী করে তুলেছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশের হিন্দুদেরও ইসলাম বিষয়ে কৌতূহলী করে তুলেছে। তাই তাদের মধ্যে ইসলামকে জানার আগ্রহ অনেক বেড়ে গিয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল, এই সুযোগে কিছু বুদ্ধিজীবী, বিশেষ করে তথাকথিত সেকুলার ও মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীরা (বা দুর্বুদ্ধিজীবীরা) মাঠে নেমে পড়েছেন এবং দেশের

সাধারণ মানুষের সামনে ইসলামের এক বিকৃত চিত্র তুলে ধরে তাদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁরা বলে চলেছেন যে, ইসলামের অর্থ হল শান্তি, তাই ইসলাম হল শান্তির ধর্ম। তাঁরা জেনেশুনে এই অসত্য বলে চলেছেন যে, কোরাণে কোথাও কাটাকাটি ও মারামারির কথা লেখা নেই এবং যে সব মুসলমান সন্ত্রাসবাদীরা ওই সব কাজ করছে, তারা কোরাণের নির্দেশকে অমান্য করেই খুন খারাপি, রক্তারক্তি করে চলেছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। তাই আরবের নিরক্ষর পশুপালকদের দ্বারা উদ্ভুত ইসলামী তত্ত্বের প্রকৃত চরিত্র মানুষের সামনে তুলে ধরা খুবই জরুরী হয়ে পড়েছে।

কোরাণ এবং হাদিস হল ইসলামী শাস্ত্রের মূল আকরগ্রন্থ। পৃথিবীর সমস্ত মুসলমান বিশ্বাস করে যে কোরাণ স্বয়ং আল্লার বাণী এবং ওহী বা প্রত্যাদেশ হিসাবে দেবদুত জিব্রাইল সেই বাণী নবী মহম্মদকে শোনাতো। প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীতে কোরাণ অবতীর্ণ হবার অনেক আগেই আল্লা একখানা স্বর্গীয় কোরাণ লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন। দেবদূত জিব্রাইল (বাইবেলের গ্যাব্রিয়েল) স্বর্গ থেকে মণিমুক্তা খচিত সেই স্বর্গীয় কোরাণখানা সঙ্গে করে নিয়ে আসতো এবং তা থেকে অংশ বিশেষ নবী মহম্মদকে পড়ে শোনাতো। এইভাবেই মহম্মদের কাছে আল্লার ওহী বা প্রত্যাদেশ পৌঁছে যেত। **জিব্রাইল পড়ে শোনাতো বলে কোরাণের প্রত্যাদেশকে বলা হয় পঠিত প্রত্যাদেশ বা ওহী-এ-মৎলু।**

ওহী আসার তেমন কোন বাঁধা ধরা সময় ছিল না। নবী উটের পিঠে যুদ্ধ যাত্রা করছেন, বা যুদ্ধ ক্ষেত্রে যুদ্ধ পরিচালনা করছেন, এমন কি, বিবি আয়শার সাথে লেপের তলায় শুয়ে আছেন, এমন সময়ও আল্লার ওহী এসে যেত। **৬১০ খ্রীষ্টাব্দে রমজান মাসের সম্ভবত ২৭ তারিখে, শবেকদরের রাত্রিতে সর্বপ্রথম কোরাণের বাণী অবতীর্ণ হয় এবং পরবর্তী ২৩ বছর ধরে ধীরে ধীরে সমগ্র কোরাণ অবতীর্ণ হয়।** বাণী অবতীর্ণ হলে মহম্মদ তা তাঁর শিষ্যদের শোনাতেন এবং তারা খেজুড় পাতা, চামড়া, হাড় বা নিজেদের বুকে তা লিখে রাখত। নবী মহম্মদ মারা যাবার কয়েক বছর পরে খলিফা আবুবকরের সময় সমগ্র কোরাণ সঙ্কলিত হয়।

পৃথিবী থেকে স্বর্গের দূরত্ব ৫০০ বছরের পথ। কিন্তু ৬০০ (মতান্তরে ৬

লক্ষ) ডানা বিশিষ্ট ফেরেস্তা জিব্রাইল একদিনে ওই দূরত্ব অতিক্রম করত। সাধারণত, আল্লার বাণী নিয়ে জিব্রাইল সকালবেলা স্বর্গ থেকে রওনা দিত এবং সন্ধ্যাবেলায় পৃথিবীতে পৌঁছে তা নবী মহম্মদকে শোনাতো। এবং সন্ধ্যাবেলায় পৃথিবী থেকে রওনা দিয়ে সকালবেলা স্বর্গে পৌঁছে যেত। তার এই ঘন ঘন আসা যাওয়ার ফলে মদিনার মসজিদের বাবে জিব্রাইল নামক দরজার ঘাস মরে গিয়ে রাস্তা তৈরী হয়ে গিয়েছিল। তাই জিব্রাইল যে কোরাণের বাণী নিয়ে আসতো তার সপক্ষে এর থেকে বড় প্রমাণ আর কি হতে পারে।

কোরাণের মত হাদিসের উৎসও হল আল্লার প্রত্যাদেশ বা ওহী। কিন্তু হাদিসের ওহী জিব্রাইল শুধু মুখে বলত, পড়ে শোনাতো না। **তাই হাদিসের বাণীকে বলা হয় অপঠিত প্রত্যাদেশ বা ওহী-এ-গৈরমৎলু।** নবীমহম্মদ হাদিসের প্রত্যাদেশ তাঁর শিষ্যদের শোনাতেন বটে, তবে তা লিখে রাখতে নিষেধ করতেন। তাই তা মানুষের মুখে মুখে প্রচারিত হত। ফলে তার মধ্যে অনেক গলদ ঢুকে যায়। তাই হিজরির ৯৯ সালে খলিফা দ্বিতীয় ওমর সঠিক হাদিস সঙ্কলনের ওপর জোর দেন। ফলে হিজরির তৃতীয় শতাব্দীতে হাদিসের ১৪৬৫ খানা সঙ্কলন লেখা হয়। **এর মধ্যে মাত্র ৬ খানা হাদিস মুসলীম জগতে মান্য এবং এরা হল (১) বোখারী, (২) মুসলীম, (৩) আবু দাউদ, (৪) তিরমিজি, (৫) নাসারী ও (৬) ইবনে মাজা সঙ্কলিত হাদিস।** এবং এর মধ্যে মাত্র দুখানা, **বোখারী ও মুসলীম সঙ্কলিত হাদিস, সর্বাপেক্ষা বিশ্বাসযোগ্য। তাই তাদের বলা হয় "সহীহ্ হায়েন" বা বিশুদ্ধ দুই।** যেহেতু কোরাণ এবং হাদিস, দুইয়েরই উৎস আল্লার স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ, তাই মুসলমানদের কাছে তা সমান মান্য। সেই কারণে কোরাণ ও হাদিসে মুসলমানরা কোন তফাৎ করে না।

যাই হোক, কোরাণ এবং হাদিস - এর সামান্য কিছুটা পাঠ করলেই দেখা যাবে যে, ইসলাম হল অত্যন্ত সাম্প্রদায়িক চরম এক ঘৃণার তত্ত্ব এবং এর মূলে রয়েছে তিনটি সিদ্ধান্ত। এই তিনটি সিদ্ধান্ত হল, (১) **মিল্লাৎ ও কুফর**, (২) **দার-উল-ইসলাম ও দার-উল-হার্ব** এবং (৩) **জিহাদ**।

মিল্লাৎ ও কুফর

মিল্লাৎ বলতে বোঝায় সৌভ্রাতৃত্ব। কিন্তু ইসলামের সংকীর্ণ অর্থে মিল্লাৎ হল মুসলমানে মুসলমানে সৌভ্রাতৃত্ব। অর্থাৎ দেশগত, ভাষাগত, সংস্কৃতিগত এবং অন্যান্য সমস্ত বিভেদ সত্ত্বেও দুনিয়ার সব মুসলমান ভাই ভাই, বা "কুল্ল মুসলেমিন ইখুয়াতুন"।

৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে নবী মহম্মদ শেষবারের মত মক্কায় হজ্জ করতে যান, যাকে "বিদায় হজ" (Farewell Pilgrimage) বলা হয়ে থাকে। সেই সময় নবী মক্কার নিকটবর্তী আরাফৎ ময়দানে একটি ভাষণের মধ্য দিয়ে ইসলামের মূলনীতি ব্যাখ্যা করেন, যাকে "বিদায় ভাষণ" বলা হয়ে থাকে। এই বিদায় ভাষণের বিষয়বস্তু ছিল তিনটি উপদেশ - (১) যদি মুসলমানরা আল্লার কোরাণ ও (২) আল্লার রসুল মহম্মদকে দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করতে থাকে এবং (৩) প্রতিটি মুসলমান অন্য কোন মুসলমানকে ভাইয়ের মত আপন মনে করতে থাকে , তবে তাদের কেউ ধ্বংস করতে পারবে না। নবীর উপরিউক্ত ভাষণ থেকে জন্ম নিয়েছে মুসলমানদের আন্তর্জাতিক সৌভ্রাতৃত্ব বা ইসলামী উম্মা (Pan Islamism)। **এই মিল্লাৎকে অনুসরণ করেই বাংলার একজন মুসলমান তার প্রতিবেশী বাংলাভাষী একজন হিন্দুকে শত্রুজ্ঞান করে। পক্ষান্তরে হাজার মাইল দূরের উর্দুভাষী একজন পাকিস্তানীকে আপন জ্ঞান করে।**

এ ব্যাপারে আল্লা বলছেন, "হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা আল্লাকে যথার্থভাবে ভয় কর। এবং তোমরা মুসলমান (আত্মসমর্পণকারী) না হয়ে মরো না। এবং **তোমরা আল্লার রশি দৃঢ়ভাবে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। তোমাদের প্রতি আল্লার অনুগ্রহকে স্মরণ কর। তোমরা পরস্পরের শত্রু ছিলে এবং তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতির সঞ্চার করেন। ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই হলে।**" (কোরাণ - ৩/১০২-১০৩)।

"পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ ব্যয় করলেও তুমি তাদের অন্তরে প্রীতি স্থাপন করতে পারতে না, কিন্তু আল্লা তাদের মধ্যে প্রীতি স্থাপন করেছেন" (ঐ - ৮/৬৩)। **"বিশ্বাসীগণ পরস্পরের ভাই ভাই, সুতরাং তোমরা ভ্রাতৃগণের**

মধ্যে শান্তি স্থাপন কর" (ঐ-৪৯/১০)।

আরবী শব্দ কুফর বলতে বোঝায় অবিশ্বাস করা বা বিরোধিতা করা। **বিশেষ অর্থে আল্লার কোরাণ ও আল্লার রসুল মহম্মদে অবিশ্বাস করা বা তার বিরোধিতা করা। যারা এই অবিশ্বাস করে তারাই হল কুফরকারী কাফের।** সুতরাং **ইসলামের দৃষ্টিতে প্রতিটি অমুসলমানই কাফের**। পাঁচটি স্তম্ভের ওপর ইসলাম দাঁড়িয়ে আছে এবং এগুলো হল, (১)'**কলেমা**, (২) **নামাজ**, (৩) **রোজা**, (৪) **যাকাৎ** ও (৫) **হজ**। প্রথম স্তম্ভ কলেমা (বা ইমান) বলতে বোঝায় ৬টি **সঙ্কল্প** বাক্য। **প্রথম কলেমা বা কলেমা তৈয়র বলছে, "লা ইলাহা ইল্লাল্লা, মহম্মদুর রসুলুল্লা," অর্থাৎ "আল্লা ছাড়া কোন উপাস্য নেই, মহম্মদ আল্লার রসুল।"** ইসলামী শাস্ত্রে এই কলেমার গুরুত্ব সর্বাধিক এবং তাই একে বলা যায় ইসলামের প্রাণ। যে কোন অমুসলমানকে মুসলমান হতে গেলে সর্বপ্রথম এই কলেমায় দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হবে। পক্ষান্তরে, এই কলেমায় সামান্যতম অবিশ্বাস করলে অতি গোঁড়া মুসলমানও সঙ্গে সঙ্গে কাফের হয়ে যাবে।

প্রকৃতপক্ষে আরবী শব্দ **"ইসলাম"-এর অর্থ নিঃসর্ত আত্মসমর্পণ** (শান্তি নয়)। **সঙ্কীর্ণ অর্থে আল্লার কোরাণ ও আল্লার রসুল মহম্মদের কাছে আত্মসমর্পণ এবং "মুসলমান" শব্দের অর্থ আত্মসমর্পণকারী।** এই সব কথাবার্তার পিছনে যে সত্য লুকিয়ে আছে তা হল, ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ দুই রকমের। যারা আল্লার কোরাণ ও আল্লার রসুল মহম্মদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে তারা হল **ইমানদার** মুসলমান বা মোমেন। আর যারা তা করেনি, তারা হল **ঘৃণ্য কাফের**। অর্থাৎ **ইসলাম পৃথিবীর সমগ্র মানব সমাজকে দুই ভাগে ভাগ করে। প্রথম দলে রয়েছে সব কোরাণে বিশ্বাসী মুসলমান এবং দ্বিতীয় দলে রয়েছে সব অমুসলমান কাফের।**

কোরাণ পড়েছে এবং ইসলাম জানে, হিন্দুদের মধ্যে এরকম লোক খুবই কম। এই সুযোগ নিয়ে মুসলমানরা হিন্দুদের চিরকাল বোকা বানিয়ে আসছে। বর্তমানে তারা আরও একভাবে তাদের বোকা বানাবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মুসলমান লেখক, বুদ্ধিজীবী ও সাংবাদিকরা বলে বেড়াচ্ছেন যে, কাফের বলতে বোঝায় নিরীশ্বরবাদী নাস্তিক ব্যক্তি। এদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে আমাদের

তথাকথিত হিন্দু সেকুলারবাদীরাও ঐ একই কথা বলে চলেছে। যদি তাই হত তবে মুসলমানদের উচিত ছিল সবার আগে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা, কারণ তারা ঈশ্বর মানে না। তারা নাস্তিক, কারণ তাদের মার্কসবাদী তত্ত্বে ঈশ্বরের কোন স্থান নেই। কাফেরের অর্থ যদি নাস্তিক হত তবে মুসলমান সন্ত্রাসবাদীদের পক্ষে কাশ্মীরের ও বাংলাদেশের হিন্দুদের হত্যা করা সম্ভব হত না। কারণ সেই সব হিন্দুরা নাস্তিক নয় এবং তারা হিন্দু দেবদেবীতে বিশ্বাসী। যদি তাই হত তবে প্যালেস্টাইনের মুসলমানদের পক্ষে সম্ভব হত না ইজরাইলের ইহুদীদের হত্যা করা। কারণ সেই সব ইহুদীরা তাদের ঈশ্বর ইয়াওয়েতে গভীরভাবে বিশ্বাসী। যদি তাই হত তবে ওসামা বিন লাদেনের পক্ষে পৃথিবীর সমস্ত মুসলমানকে ডাক দেওয়া সম্ভব হত না যে. আমেরিকার নাগরিকদের যেখানে পাবে, সেখানেই হত্যা করবে। কারণ আমেরিকার লোকরা নিরীশ্বরবাদী নয়, তারা বাইবেল-এর গডে গভীরভাবে বিশ্বাসী।

বর্বর মুসলমান আক্রমণকারীরা যখনই ভারতে পা রাখল, তখনই তারা হিন্দুদের কাফের বলে চিহ্নিত করল। শুধু কাফেরই নয়, তাদের বিচারে হিন্দুরা অত্যন্ত নিকৃষ্ট মুশরিক বলে সাব্যস্ত হল। কারণ তারা মূর্তি পূজা করে। যে সব লোকেরা আল্লা ছাড়া অন্য কোন দেবদেবীর পূজা করে, ইসলামের দৃষ্টিতে তারা হল অংশীবাদী, কারণ তারা আল্লার শরিক খাড়া করে। আরবীতে একে বলে শির্ক। আল্লার দৃষ্টিতে এই শির্ক হল সর্বাপেক্ষা গুরুতর পাপ, যার কোন ক্ষমা নেই। আর যারা মূর্তিপূজার নাম করে আল্লার শরিক খাড়া করে, তাদের বলে মুশরিক। **কাজেই আল্লার দৃষ্টিতে সব হিন্দুই ঘৃণিত মুশরিক। এই সব মুশরিকদের শাস্তি দেবার ব্যাপারে আল্লা অত্যন্ত নির্মম ও কঠোর।**

কেয়ামৎ বা শেষ বিচারের দিন আল্লা সব মানুষকে কবর থেকে পুনরুত্থিত করে হাসরের ময়দানে জমায়েৎ করবেন এবং তাদের বিচার করবেন। মুসলমানরা মহম্মদের সত্যধর্ম গ্রহণ করার ফলে সবাই স্বর্গে যাবে, এবং সমস্ত কাফের নরকে যাবে। আল্লা অত্যন্ত বিজ্ঞ ও বিজ্ঞানময়। তাই তিনি এই সব কাফেরদের জন্য সাত রকমের নরক তৈরি করে রেখেছেন। সব থেকে কম যন্ত্রণার নরকে আগুন পায়ের পাতা পর্যন্ত। পরবর্তী নরকগুলিতে আগুন

ক্রমশ উপরের দিকে উঠবে। কোন নরকে আগুন হাটু পর্যন্ত, কোন নরকে কোমর পর্যন্ত, কোন নরকে বুক পর্যন্ত ইত্যাদি। সর্বাপেক্ষা পাপী মুশরিকদের আল্লা হাভিয়া নরকে ঠেলবেন এবং সেখানে আগুন মাথা পর্যন্ত উঁচু হবে এবং তার জ্বালা পোড়া হবে পার্থিব আগুনের ৭০ গুণ বেশী। সেই আগুনে আল্লা পাপী মুশরিকদের ঝলসাবেন এবং প্রত্যেক বার ঝলসাবার পর নতুন চামড়ার সৃষ্টি করবেন, যাতে তারা অনন্তকাল ধরে শাস্তি ভোগ করতে পারে। তাই কোরাণ বলছে, **"নিশ্চয় যারা আমার নিদর্শন সমূহের প্রতি অবিশ্বাসী হয়েছে, তাদের নিশ্চয় আমি নরকানলে প্রবেশ করাব, যখন তাদের চামড়া দগ্ধ হবে, আমি তখন তাদের চামড়া বদল করে (নতুন চামড়া) দেব, যাতে তারা (অনন্তকাল) শাস্তির আস্বাদ গ্রহণ করতে পারে, নিশ্চয়ই আল্লা পরাক্রান্ত ও বিজ্ঞানময়" (৪/৫৬)।**

কাজেই বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় যে, যেহেতু আল্লা সমস্ত কাফের ও মুশরিকদের ঘৃণা করেন, তাই তাদের প্রতি মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গী কি হওয়া উচিত। বর্বর মুসলমান আক্রমণকারীর দল ভারতের মাটিতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল পাইকারী দরে হিন্দু হত্যা। এক দিনের মধ্যে লক্ষ লক্ষ হিন্দু কেটে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেবার ঘটনা যে কত ঘটেছে যে তা গুণে শেষ করা যাবে না। সেই সব নিহত হিন্দুদের কেউই নাস্তিক ছিল না। সকলেই হিন্দু দেবদেবীতে বিশ্বাসী ছিল। একটি মাত্র দোষের জন্যই তাদের হত্যা করা হয়েছিল, তা হল তারা আল্লার কোরাণ ও আল্লার রসুল মহম্মদে বিশ্বাস করত না। অর্থাৎ তারা কলেমা তৈয়বে বিশ্বাস করত না। তাই তারা মুশরিক কাফের বলে চিহ্নিত হয়েছিল। সেই একই কারণে আজ বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে হিন্দুদের নিমর্মভাবে হত্যা করা হচ্ছে। হিন্দু মহিলারা বলাৎকারের শিকার হচ্ছেন।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে যে সত্য বেরিয়ে আসে তা হল, ইসলাম একটি চূড়ান্ত সাম্প্রদায়িক ও ঘৃণার তত্ত্ব এবং এর প্রথম সিদ্ধান্ত "মিল্লাৎ ও কুফর" - এর উদ্দেশ্য হল **সমগ্র মানব সমাজকে (১) মুসলমান ও (২) কাফের এই দুই দলে বিভক্ত করা। এবং মুসলমানদের মনে কাফেরদের প্রতি চরম ঘৃণা ও চিরন্তন শত্রুতা তৈরি করা।** আল্লার দৃষ্টিতে কাফেররা জন্তু

জানোয়ার থেকেও জঘন্য, তাই তারা ঘৃণার পাত্র। উপরন্তু তারা আল্লার শত্রু, ইসলামের শত্রু, নবী মহম্মদের শত্রু। তাই তারা নির্মমভাবে বধযোগ্য। সেই কারণে আল্লার বান্দা মুসলমানরা এই ঘৃণিত কাফেরদের ওপর অত্যাচার করলে, তাদের সহায় সম্বল লুঠ করলে, তাদের জমি জায়গা দখল করলে এবং কাফের মহিলাদের বলাৎকার করলে আল্লা খুশী হন এবং অত্যাচারকারী ওই সব মুসলমানকে তিনি নানাভাবে পুরস্কৃত করেন।

তাই কোরাণ বলছে--**"আমি অবশ্যই নরকের জন্য বহু জ্বেন ও মানব সৃষ্টি করেছি তাদের হৃদয় আছে, কিন্তু তারা উপলব্ধি করে না। তাদের চক্ষু আছে কিন্তু দেখে না; তাদের কর্ণ আছে কিন্তু শোনে না; ওরা পশুর ন্যায়।** এবং তা অপেক্ষাও অধিক মূঢ়, তারাই উদাসীন" (৭/১৭৯)। **"যে কেহ ইসলাম ব্যতীত অন্য মতের অনুসরণ করলে তা কখনও গৃহীত হবে না, এবং পরলোকে সে ক্ষতিগ্রস্তগণের অন্তর্ভুক্ত হবে"** (৩/৮৫) **"আমি অচিরেই অবিশ্বাসীদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করছি । অতএব তাদের গর্দানে আঘাত করে মস্তক ছিন্ন কর এবং তাদের অঙ্গুলী সমূহ ছিন্ন কর। ইহা এই জন্য যে তারা আল্লা ও তাঁর রসুলের বিরোধিতা করেছিল এবং যে আল্লা ও তাঁর রসুলের বিরোধিতা করে, তবে আল্লা নিশ্চয়ই কঠোর শাস্তিদাতা"** (৮/১২-১৩)। **"যারা অবিশ্বাস করেছে, আমি তাদেরকে ইহকাল ও পরকালে কঠোর শাস্তি দান করব।....আর যারা বিশ্বাস করেছে এবং সৎ কাজ করেছে, তাদেরকে পূর্ণ পুরস্কার দেওয়া হবে। আল্লা অত্যাচারীগণকে (কাফেরগণকে) ভালবাসেন না"** (৩/৫৬-৫৭)। **পরলোকে তাদের (সত্য বা ইসলাম প্রত্যাখ্যানকারীদের) কোন অংশে নাই, এবং আল্লা তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং উত্থান দিবসে (বা শেষ বিচারের দিন) তাদের প্রতি দৃষ্টি দিবেন না। এবং তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আছে"** (৩/৭৭)। **"আল্লা তাঁর শরিক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না, ইহা ব্যতীত যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যে কেহ আল্লার শরিক করে, সে মহা অপরাধী"** (৪/৪৮)। **"যারা অবিশ্বাস করেছে, আমি সত্বর তাদের অন্তরসমূহে ভীতির সঞ্চার করব যেহেতু তারা আল্লার সাথে অংশী স্থির করেছে।....নরক তাদের আবাসস্থান এবং অবশ্যই তা নিকৃষ্ট বাসস্থান"** (৩/১৫১)। "....তোমাদের (অবিশ্বাসীদের) ও আমাদের

(বিশ্বাসীদের) মধ্যে চির শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হবে, যদি তোমরা এক আল্লাতে বিশ্বাস স্থাপন না কর" (৬০/৪)। "আল্লার কাছে অবিশ্বাসকারীরাই নিকৃষ্ট জীব, কারণ তারা (কোরাণে) অবিশ্বাস করে" (৮/৫৫)। "ওরা (কাফেররা) আল্লার পরিবর্তে এমন কিছুর উপাসনা করে যা ওদের উপকারও করতে পারে না, অপকারও করতে পারে না। অবিশ্বাসীরা স্বীয় প্রতিপালকের বিরোধী" (২৫/৫৫)। "মহম্মদ আল্লার রসুল। তার অনুগামীগণ অবিশ্বাসীদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল" (৪৮/২৯)। "আমাদের মধ্যে কতক আত্মসমর্পণকারী (মুসলমান), কতক অবাধ্যচারী (কাফের)। যারা আত্মসমর্পণ করে তারা সুচিন্তিতভাবেই সৎ পথ বেছে নেয়। অপর পক্ষে অবাধ্যচারীরা তো নরকের ইন্ধন" (৭২/১৪-১৫)। "তোমাদের পিতা ও ভ্রাতা যদি বিশ্বাস অপেক্ষা অবিশ্বাসকে শ্রেয় জ্ঞান করে, তবে তাদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করো না" (৯/২৩)। অর্থাৎ একজন মুসলমানের কাছে কাফের আত্মীয়রাও ঘৃণার পাত্র।

কোরাণের উপরিউক্ত আয়াৎগুলি থেকে বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় যে, ইসলাম হল চূড়ান্ত সাম্প্রদায়িক, চরম এক ঘৃণার তত্ত্ব। একমাত্র মুসলমানরাই আল্লার প্রিয়পাত্র, আর অমুসলমানরা তাঁর দৃষ্টিতে পশুর সমান ঘৃণ্য এক জন্তু বিশেষ। সেই সঙ্গে সঙ্গে আল্লা তাঁর বান্দাদের উপদেশ দিচ্ছেন তারাও যেন কাফেরদের প্রতি সমান ঘৃণা পোষণ করে। শুধু তাই নয়, আল্লা তাঁর বান্দাদের কাফেরদের ওপর যে কোন রকমের অত্যাচার করার অধিকার দিয়ে রেখেছেন। আল্লা বলেছেন তিনি কাফেরদের মনে ভীতির সঞ্চার করবেন, তাই তার বান্দারা আত্মীয় স্বজনের সামনে কাফেরদের কেটে কুচি কুচি করে। কাফের রমণীদের তার স্বামী পুত্রদের সামনে বলাৎকার করে, কাফের শিশুদের আছাড় দিয়ে মারে, আরও কত কি। মদিনার ইহুদীদের মনে ত্রাসের সঞ্চার জন্য নবী মহম্মদ প্রথমে নজির ও কানুইকা গোত্রের ইহুদীদের মদিনা থেকে বিতাড়িত করলেন এবং ৬২৭ সালে কুরাইজা গোত্রের ইহুদীদের গণহত্যা করলেন। আগের দিন কুরাইজাদের ৮০০ সক্ষম পুরুষকে দিয়ে মদিনার বাজারে ৮০০ মানুষ মাটি চাপা দেবার মত বিশাল এক গর্ত খোড়া হল এবং রাত্রে একটা গুদাম ঘরে সেই ৮০০ ইহুদীকে বন্দী করে রাখা হল। ভোরে, ফজর-এর

নামাজের পরেই শুরু হল কোতল পর্ব। ৫/৬ জন বন্দীকে ডেকে আনা হতে লাগল এবং গর্তের কিনারায় তাদের উপুড় হয়ে শুয়ে পড়তে বলা হল। এবং নবীর চাচা হামজা এবং চাচাত ভাই তাল্‌হা, যুবায়ের এবং আলি তাদের গলা কেটে গর্তে ফেলতে লাগল। এইভাবে ৮০০ মানুষকে কোতল করতে সন্ধ্যা গড়িয়ে গেল।

কুরাইজা মহিলাদের মুসলমানরা নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিল এবং বয়স্কা মহিলা ও শিশুদের বেদুইন উপজাতি লোকদের কাছে ঘোড়া ও অস্ত্রশস্ত্রের বিনিময়ে ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রয় করা হল। **কুরাইজা সুন্দরী রেহানাকে নবী আগে থেকেই নিজের জন্য পছন্দ করে রেখেছিলেন। সারাদিন ধরে ৮০০ কুরাইজার কোতল পর্ব সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করে নবী ক্লান্তি দূর করার উদ্দেশ্যে রেহানার সাথে শয়ন করতে চললেন।** বিখ্যাত মুসলমান লেখক আনোয়ার শেখ মহাশয়ের মতে সেই সময় ৮০০ কুরাইজার গণহত্যা আজ ৮০,০০০ নর হত্যার সমান। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, ইসলামের প্রবর্তক **নবী মহম্মদ দুনিয়ার সমস্ত মুসলমানের সামনে কি অমানবিক, পাশব ও দানবীয় আদর্শ রেখে গিয়েছেন।**

তার উপরে রয়েছে আল্লা নামক জল্লাদের নানান প্রলোভন। কোন মুসলমানকে পুণ্য সঞ্চয় করার জন্য ত্যাগ তিতিক্ষা, সাধনা তপস্যা, ইত্যাদি কিছুরই প্রয়োজন নেই। **ইসলামের মতে পুন্য সঞ্চয়ের সব থেকে প্রশস্থ রাস্তা হল কাফেরদের উপর অত্যাচার করা। তাদের ধন-সম্পত্তি লুঠ করা, তাদের ঘরবাড়িতে আগুন দেওয়া এবং তাদের সক্ষম পুরুষদের হত্যা করা, নারী ও শিশুদের ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রী করা বা তাদের ভোগ্য বস্তুতে পরিবর্তন করা।** যে ভাগ্যবান মুসলমানরা একজন কাফেরও হত্যা করবে, আল্লার দৃষ্টিতে তারা হবে গাজী। আল্লার স্বর্গে সেইসব খুনীরা হবে আল্লার বিশেষ অতিথি। আল্লা তাদের অনন্তকাল জান্নাৎ-ই-ফেরদৌস নামক সর্ব্বোচ্চ স্বর্গে বসবাস করার অধিকার দেবেন এবং সমস্ত রকম পার্থিব ও যৌন সুখের অঢেল ব্যবস্থা করবেন!

কাজেই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, ইসলামের মিল্লাৎ বা সৌভ্রাতৃত্ব শুধু মুসলমানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অমুসলমান কাফেরদের কোন স্থান এই ইসলামী

সৌভ্রাতৃত্বে নেই। তাই এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে বাবাসাহেব আম্বেদকর লিখেছেন, **"ইসলামের সৌভ্রাতৃত্ব (মিল্লাৎ) সমগ্র মানব জাতির জন্য নয়। এ হল মুসলমানদের মধ্যে মুসলমানদের সৌভ্রাতৃত্ব। এই সৌভ্রাতৃত্বের সুফল শুধু মুসলমানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। যারা এর বাইরে তাদের জন্য আছে শুধু ঘৃণা ও শত্রুতা।"**[1] ইংল্যাণ্ডে বসবাসকারী লেখক শ্রী আনোয়ার শেখ এ ব্যাপারে লিখেছেন, **"মানবজাতির প্রতি ইসলামের ভালবাসা এক চূড়ান্ত মিথ্যাচার। ইসলামের অস্তিত্বের মূলে রয়েছে অমুসলমানদের প্রতি ঘৃণা। অমুসলমানদের শুধু নরকের অধিবাসী বলেই ইসলাম ক্ষান্ত থাকছে না। মুসলমান ও অমুসলমানদের মধ্যে চিরস্থায়ী এক ঘৃণা ও সংঘাত বিদ্যমান রাখাই ইসলামের উদ্দেশ্য"**[2]। যে কতিপয় হিন্দু চিন্তা নায়ক ইসলাম সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী ছিলেন, তাঁদের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী অগ্রগণ্য। ইসলামী সৌভ্রাতৃত্বে ব্যাপারে স্বামী বিবেকানন্দ লিখছেন, **"মুসলমানরা মুখে বলে চলেছে সার্বজনীন সৌভ্রাতৃত্বের কথা, কিন্তু বাস্তবে কি দেখা যাচ্ছে? কোন অমুসলমান ব্যক্তির পক্ষে এই ভ্রাতৃত্বের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সম্ভব নয় তো বটেই, বরং তার গলা কাটা যাবার সম্ভাবনাই দেখা দেবে"**[3]।

স্বামী বিবেকানন্দ ইসলামী ঘৃণার তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে আরও লিখছেন, **"তাহাদের (মুসলমানদের) মূলমন্ত্র, "আল্লা এক এবং মহম্মদই এক মাত্র পয়গম্বর"। যাহা কিছু ইহার বহির্ভূত সে সমস্ত কেবল খারাপই নহে, উপরন্তু সে সমস্তই তৎক্ষণাৎ ধ্বংস করিতে হইবে; যে কোন পুরুষ বা নারী এই মতে সামান্য অবিশ্বাসী তাহাকেই নিমেষে হত্যা করিতে হইবে; যাহা কিছু এই উপাসনা পদ্ধতির বহির্ভূত তাহাকেই অবিলম্বে ভাঙিয়া ফেলিতে হইবে; যে কোন গ্রন্থে অন্যরূপ মত প্রচার করা হইয়াছে সেগুলিকে দগ্ধ করিতে হইবে। প্রশান্ত মহাসাগর হইতে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত ব্যাপক এলাকায় দীর্ঘ পাঁচশত বৎসর ধরিয়া রক্তের বন্যা বহিয়া গিয়াছে। ইহাই মুসলমান ধর্ম"**[4]।

---

1. Babasaheb Ambedkar, Pakistan or Partition of India. Government of Maharastra Publication. 330.
2. Anwar Shaikh, Islam, Principality Publications (UK), 28.
3. Swami Vivekananda, Jnanayoga.
4. Swani Vivekananda, Practical Vedanta.

আগেই বলা হয়েছে যে, মুসলমানদের পক্ষে সর্বাপেক্ষা পুণ্যের কাজ হল অমুসলমান কাফেরদের ওপর অত্যাচার করা। এই কাজের পুরস্কার স্বরূপ আল্লা নানা রকমের প্রলোভন মুসলমানদের সামনে রেখেছেন। **এই সব পুরস্কার দুই ভাগে বিভক্ত, ইহলৌকিক ও পারলৌকিক। ইহলৌকিক পুরস্কার হল লুঠের মাল এবং পারলৌকিক পুরস্কার হল স্বর্গের ভোগ সুখ।** কাফেরদের ধন-সম্পত্তি লুটপাট করে যে লুটের মাল পাওয়া যাবে তার এক পঞ্চমাংশ ইসলামী সংস্থাকে দিতে হবে। বাকীটা সব মুসলমানের মধ্যে সমান ভাগ হবে। জীবিতাবস্থায় নবী নিজে ওই এক পঞ্চমাংশ লুটের মালের মালিক হতেন। এখানে বলে রাখা দরকার যে, **কাফের মহিলারাও লুটের মালের মধ্যে গণ্য। নবীর জীবিতকালে সর্বাপেক্ষা সুন্দরী মহিলাটির মালিক হতেন নবী স্বয়ং।** এবং অন্যান্য মহিলাদের মুসলমানদের মধ্যে ভাগ করা হত বা ক্রীতদাসী হিসাবে বিক্রী করা হত।

পারলৌকিক প্রলোভনের ব্যাপারে প্রথমেই বলে রাখা দরকার যে, মহম্মদের সত্যধর্ম ইসলাম কবুল করার পুরস্কার হিসাবে অত্যন্ত পাপাচারী অধঃপতিত মুসলমানও আল্লার জান্নাতে (স্বর্গে) প্রবেশ করবে। পক্ষান্তরে অত্যন্ত সৎকর্মকারী, সত্যবাদী, পুন্যাত্মা কাফের, শুধু ইসলাম কবুল না করার অপরাধে স্থান পাবে আল্লার নরকে। **শুধু ইসলাম গ্রহণ করার পুরস্কার হিসাবে শেষ বিচার বা কেয়ামতের দিন আল্লা মুসলমানদের পাহাড় প্রমাণ পাপ ক্ষমা করে দেবেন। শুধু মাত্র "লা ইলাহা ইল্লাল্লা, মহম্মদুর রসুলুল্লা" কলেমা গ্রহণ করার জন্য অত্যন্ত পাপমতি, পাপাচারী, পতিত মুসলমানও আল্লার জান্নাতে প্রবেশ করবে।** এখানে বলে রাখা উচিত হবে যে, এ সব সুযোগ সুবিধা শুধু পুরুষ মুসলমানরাই পাবে। যত পুণ্য করুক না কেন, মুসলমান মেয়েরা সবাই নরকে যাবে।

আরবের মক্কা শহরের ঠিক উপরেই আল্লা তৈরি করে রেখেছেন তাঁর জান্নাৎ বা স্বর্গ এবং মক্কার কাবা-র ঠিক ওপরেই রয়েছে স্বর্গের কেন্দ্র যেখানে রয়েছে স্বর্গীয় কাবা। অর্থাৎ স্বর্গের সেই কাবা থেকে একটা ওলন দড়ি ঝুলিয়ে দিলে তা মক্কার কাবাকে স্পর্শ করবে। স্বর্গে রয়েছে ৮টি শ্রেণী, সবার নিচে খেলদ্। তারপর দারস্ সালাম, দারুন, অদন, নঈম, মাওয়া, অলঅইন এবং

সবার ওপরে ফেরদৌস। যে ব্যক্তি আল্লার সেই জান্নাতে প্রবেশ করবে সে সবসময় সুখে থাকবে এবং অমর হবে। তার বস্ত্র জীর্ণ হবে না এবং যৌবন লুপ্ত হবে না, কারণ তাদের বয়স ৩২-এর বেশি বাড়বে না।

সেখানে রয়েছে নির্মল পানির নহর (খাল), অপূর্ব স্বাদের দুধের নহর, সুস্বাদু সুরার নহর, সুমিষ্ট মধুর নহর, আর আছে স্বর্গীয় ফলমূল ও নানা রকমের জান্নাতি খাবার। জান্নাতের একটা খেজুড় হবে ১২ হাত লম্বা এবং তাতে কোন বীচি থাকবে না। একটা জান্নাতি আঙ্গুর থেকে এত সুমিষ্ট রস পাওয়া যাবে যে, একটা মশক ভর্তি হয়ে যাবে। কেউ ফল খেতে চাইলে গাছ নত হয়ে ফল তার মুখে গুঁজে দেবে। আর থরে থরে সাজানো থাকবে মাংস, পোলাও আরও কত কি। মুসলমানরা সেই অপূর্ব জান্নাতি খাবার যাই খাবে তা সবই ১০০ শতাংশ হজম হয়ে যাবে। তাই মলমূত্র ত্যাগের প্রয়োজন হবে না। তাছাড়া সেখানে হাঁচি কাশি, কফ থুথু ইত্যাদিও হবে না।

আল্লার জান্নাতের সব থেকে বড় আকর্ষণ হল সেখানকার অপ্সরা সদৃশ সুন্দরী রমণীরা। আল্লা সেই সব হুরীদের আলোর দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। জান্নাতবাসী মুসলমানরা যখনই তাদের সঙ্গে মিলিত হবে, তখনই তারা তাদের কুমারী দেখতে পাবে। এই সব হুরীরা হবে চির যৌবনা এবং তাদের বয়স কখনই ১৬ অতিক্রম করবে না। তাদের গায়ের রং হবে মরকৎমণি বা ডিমের খোলার মত। তারা যে সব পোষাক পরে থাকবে তার বাইরে থেকে ভিতর দেখা যাবে। সেই সব জান্নাতি হুরীদের কাউকে যদি পৃথিবীতে নিয়ে আসা যেত বা কোন হুরী যদি তার থুতু পৃথিবীতে ফেলত তবে তার দেহভরা মৃগনাভির গন্ধে বা তার থুতুর সুমধুর গন্ধে সমস্ত পৃথিবী ভরপুর হয়ে যেত।

এক জন স্বর্গবাসী মুসলমান কতজন করে হুরী পাবে সে ব্যাপারে উলেমাদের (ইসলামী পণ্ডিতদের) মধ্যে মতভেদ আছে। আবদুল্লা বিন ওমরের মতে **স্বর্গবাসী প্রত্যেক মুসলমান ৫০০ হুরী, ৪০০ কুমারী এবং অন্য পুরুষের সঙ্গে সহবাস করেছে এমন আরও ৬০০০ অন্যান্য নারী পাবে।** তবে স্বর্গীয় যৌনতার ব্যাপারে মহম্মদের সহচর আবু হোরায়রার বর্ণনা আর সব বর্ণনাকে ম্লান করে দিয়েছে । তার মতে প্রত্যেক স্বর্গবাসী মুসলমান, সে চূড়ান্ত পাপাচারী, লম্পট এবং অত্যন্ত পতিত হলেও, **বিশাল এক জমিদারী পাবে। সেখানে**

থাকবে ৭০টি প্রাসাদ, প্রত্যেক প্রাসাদে থাকবে ৭০টা মহল, প্রত্যেক মহলে থাকবে ৭০টা ঘর, প্রত্যেক ঘরে থাকবে ৭০টা আরাম কেদারা আর প্রত্যেক আরাম কেদারায় বসে থাকবে এক জন হুরী। হিসাব করলে দেখা যাবে যে প্রত্যেক মুসলমান ২ কোটি ৪০ লক্ষ ১০ হাজার হুরী পাবে। অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও প্রজ্ঞাময় আল্লা সেই সব মুসলমানদের এত যৌন ক্ষমতা দেবেন যে তারা প্রত্যেক হুরীর সাথে মিলনে সক্ষম হবে। এ ছাড়াও স্বর্গে থাকবে নারী কেনা বেচার হাট, যেখানে থেকে স্বর্গবাসী মুসলমানরা পচ্ছন্দসই নারী কিনে আনতে পারবে। সব থেকে আশ্চর্যের ব্যাপার হল, **কোন স্বর্গবাসী মুসলমান কোন স্বর্গীয় নারীর সঙ্গে মিলিত হলে সেই মিলন ৪০ বছর স্থায়ী হবে।** কাজেই ওই ৪০ বছর আল্লার বান্দার আহার নিদ্রার কি হবে তা বোঝা খুব মুশকিল। যদি কোন বান্দা এক হুরীর সঙ্গে মিলন শেষ করে অন্য হুরীতে গমন করে তাহলে ৮০ বছর তার আহার নিদ্রার কি হবে, একমাত্র প্রজ্ঞাময় আল্লাই তা হয়তো বলতে পারেন।

প্রজ্ঞাময় আল্লা ইহলোকে মুসলমানদের জন্য সমকাম বা পুরুষে পুরুষে পায়ুকাম নিষিদ্ধ করে তার বান্দাদের অশেষ কষ্ট দিচ্ছেন। তাই **রহমানির রহিম পরমদয়ালু দয়াময় আল্লা স্বর্গে পায়ুকামের অঢেল ব্যবস্থা করবেন। প্রত্যেক স্বর্গবাসী মুসলমান সেখানে পাবে অসংখ্য স্বর্গীয় ক্রীতদাস বা গেলেমান,** যারা চিরকাল কিশোর থাকবে, কারণ তাদের বয়স কখনও ষোলর বেশি হবে না । স্বর্গবাসী মুসলমানরা প্রত্যেকে কতজন করে স্বর্গীয় ক্রীতদাস পাবে সে ব্যাপারেও মতভেদ আছে । তবে এই সংখ্যা ১০০০ থেকে কম হবে না। অন্য এক মতে তারা প্রত্যেকে ৮০,০০০ স্বর্গীয় কিশোর পাবে। উৎসাহী পাঠক এই সব বিষয়ে কোরানের (২/২৫), (৪৭/১৫), (৫২/১৯-২৮), (৫৫/৫৮-৭৮), (৫৬/২২-২৮) আয়াৎ দেখতে পারেন।

ইহজগতে আল্লা তাঁর প্রিয় বান্দাদের জন্য আরও দুটিবস্তু, সোনার অলঙ্কার ও রেশমের কাপড় নিষিদ্ধ করেছেন। সেই কারণে প্রজ্ঞাময় আল্লা স্বর্গবাসীদের জন্য এই দুটি বস্তুরও অঢেল ব্যবস্থা করবেন। সেই অনুসারে স্বর্গবাসীরা পরার জন্য পাবে উৎকৃষ্ট রেশমের জামা কাপড় এবং তাদের অলঙ্কার, আসবাবপত্র এবং অন্যান্য নিত্য ব্যবহার্য সমস্ত জিনিষপত্র হবে সোনা দিয়ে

তৈরী। আজকের বিজ্ঞানের যুগে প্রজ্ঞাময় আল্লা নিশ্চয়ই তাঁর জান্নাৎ বাতানুকুল করে রেখেছেন, যাতে তাঁর আদরের বান্দারা কোন কষ্ট না পায়। স্বর্গে এত অঢেল সুখ ভোগের ব্যবস্থা থাকায় জান্নাৎবাসী মুসলমানরা যার পর নাই খুশী হবে এবং কোন কাফেরকে সেখানে প্রবেশের অধিকার না দেবার জন্য তারা আল্লার প্রশংসা করবে।

আল্লার প্রিয় বান্দারা যখন স্বর্গে মহাসুখে দিন কাটাবে, তখন আল্লার সত্যধর্ম অস্বীকারকারী ঘৃণিত কাফেরের দল নরকের আগুনে জ্বলতে থাকবে। পরম প্রজ্ঞাময় আল্লা সাত রকমের নরক তৈরি করে রেখেছেন, যার মধ্যে সব থেকে কম যন্ত্রণাদায়ী হল জাহান্নম এবং সর্বাপেক্ষা অধিক যন্ত্রনাদায়ী নরক হল হাভিয়া। আল্লা এই সব নরকের আগুনে অবাধ্য ও অবিশ্বাসী কাফেরদের ঝলসাবেন। এবং প্রত্যেকবার ঝলসাবার পরে নতুন চামড়ার সৃষ্টি করবেন, যাতে তারা অনন্তকাল ধরে শাস্তি আস্বাদ করতে পারে। নরকের পাশেই স্বর্গের অবস্থান, মাঝে মাত্র আরাফ পাঁচিলের ব্যবধান। কাফেররা নরকের আগুনে জ্বলতে জ্বলতে মাঝে মধ্যে ফাঁক ফোকর দিয়ে স্বর্গবাসী মুসলমানদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য দেখবে আর আফসোস করে বলবে, হায় আমরা যদি সময় থাকতে কোরাণে বিশ্বাস করতাম এবং মহম্মদের সত্যধর্ম স্বীকার করতাম।

অনেক যুক্তিবাদী হিন্দু আবার এই সূক্ষ্ম যুক্তি উপস্থিত করেন যে, আল্লা সমস্ত কাফেরকে অনন্ত নরকে এবং সমস্ত মুসলমানকে অনন্ত স্বর্গে পাঠিয়ে ঠিক কাজ করেনি। কারণ, কাফেররাও কিছু ভাল কাজ করে, সেই কারণে তাদের কিছুকাল স্বর্গভোগ করা উচিত। সেই রকম অনেক মুসলমানও পাপ কাজ করে । তাই তাদেরও কিছু কাল নরকভোগ করা উচিত। এই সব হিন্দুরা একটা গোড়ায় গলদ করে ফেলেন। তাঁরা ইসলামকে আধ্যাত্মিকতার পথ প্রদর্শনকারী একটি ধর্মমত বলে ভুল করে বসেন। আসলে ইসলাম কোন ধর্মমত নয়, **ইসলাম হল একটি রাজনৈতিক মতবাদ এবং তার উদ্দেশ্য হল ইহলোকে গনিমতের(লুটের) মাল ও পরনারী সম্ভোগ এবং পরলোকে অক্ষয় স্বর্গবাসের লোভ দেখিয়ে সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং তারপর নির্বিচারে আক্রমণ, হত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ ও ধর্ষণের মধ্যে দিয়ে সাম্রাজ্য বিস্তার করা।** নবী মহম্মদের জীবিতকালে ইসলামের উদ্দেশ্য ছিল সমগ্র আরব ভূ-

খন্ডে ইসলামের সাম্রাজ্য বিস্তার করা এবং পরে তা পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্য বিস্তারের লক্ষ্যে পরিণত হয়। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই মুসলমান সন্ত্রাসবাদীরা সারা পৃথিবীব্যাপী তাদের ধ্বংসাত্মক কার্য কলাপ চালিয়ে যাচ্ছে।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, **আল্লা তার বান্দাদের জন্য ইহলোকে লুঠের মাল এবং পরলোকে জান্নাৎ নামক পতিতালয়কে তাদের অন্তিম লক্ষ্য ও আধ্যাত্মিক প্রাপ্তি স্থির করে দিয়েছেন। আল্লা তাঁর কোরাণে কোথাও বলেননি যে, ওহে মুসলমানরা, তোমরা লেখাপড়া শিখে মানুষ হও, সৎ ও সভ্য মানুষের মত জীবন যাপন কর। পক্ষান্তরে আল্লা বলছেন যে, অমুসলমানদের ধন-সম্পত্তি লুঠ করাই মুসলমানদের এক মাত্র কাজ এবং এই কাজের পুরষ্কার হিসাবে তারা পরলোকে স্থান পাবে জান্নাত নামক আল্লার বেশ্যালয়ে। এই যাদের অন্তিম লক্ষ্য, সভ্যতার পথে তারা অগ্রসর হবে কেমন করে!** কাজেই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, এই বিশ্বে মুসলমানরা কেন সব ব্যাপারে অনগ্রসর। কেন তাদের মধ্যে নিরক্ষরতা ও দারিদ্র এত ব্যাপক। (পরিশিষ্ট-২ দ্রষ্টব্য)

ইসলামের দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত

ইসলামের **দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত "দার-উল-ইসলাম ও দার -উল-হার্ব"** বলছে পৃথিবীতে দু রকমের দেশ আছে। দার-উল-ইসলাম হল সেই সমস্ত দেশ যা ইতিমধ্যে মুসলমানদের অধিকারে চলে এসেছে। বর্তমানে পাকিস্তান, আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, ইরান, ইরাক, মিশর, লিবিয়া, আলজেরিয়া ইত্যাদি ৫৬টি ইসলামী দেশ দার-উল-ইসলাম -এর নিদর্শন। এই সমস্ত সকল দেশেই ইসলামী সরকার ও ইসলামী আইনকানুন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে অমুসলমান কাফেররা সেখানে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হয়েছে। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হল, এক কালে মোঘল পাঠানদের শাসনকালে ভারতবর্ষও দার-উল-ইসলামে পরিণত হয়েছিল।

কোন ইসলামী দেশে অমুসলমানদের বসবাস করার অধিকার আছে কি না, এ ব্যাপারে উলেমাদের মধ্যে মতদ্বৈত আছে। এখানে প্রথমেই বলে রাখা দরকার যে, ইসলামী আইনশাস্ত্র বা ফিক্ (Jurisprudence) কোন ইসলামী দেশে বসবাসকারী অমুসলমানদের দু' ভাগে ভাগ করে। যে সব লোকদের নিজস্ব পয়গম্বর ও আসমানি কেতাব আছে তারা হল জিম্মী। আর যাদের তা নেই, তারা হল কাফের। এই বিচারে ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা জিম্মী, কারণ ইহুদীদের পয়গম্বর মুসা (বাইবেলের মোজেস) ও আসমানী গ্রন্থ তৌরাৎ (Torah) এবং খ্রীষ্ঠানদের পয়গম্বর যীশু এবং আসমানী কেতাব বাইবেল বিদ্যমান। কিন্তু ভাগ্যহীন হিন্দুদের না আছে তেমন একজন পয়গম্বর, না আছে একটিমাত্র আসমানী কেতাব। কাজেই ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে হিন্দুরা ঘৃণিত কাফের।

কোন ইসলামী দেশে জিম্মিরা জিজিয়া কর দিয়ে তাদের জীবন মান ও সম্পদের নিরাপত্তা অর্জন করতে পারে। কিন্তু কাফেররা সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত। কোন ইসলামী দেশে কাফেরদের জন্য মাত্র দুটো পথই খোলা আছে, হয় ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হওয়া, নয় তো মৃত্যু।

বিদেশী মুসলমান আক্রমণকারীরা যখন ভারতে আসে তখন ভারতে হিন্দুর সংখ্যা ছিল ৬০ কোটি। এই ৬০ কোটি হিন্দু কাফেরের সামনেও তখন দুটো রাস্তা খোলা ছিল, হয় ইসলাম, নয় মৃত্যু। কিন্তু মুসকিল হল এই যে,

মুসলমানরা কোটি কোটি হিন্দুকে হত্যা করল বটে, কিন্তু তাদের মুসলমান করতে পারল না। তাই ৭০০/৮০০ বছর রাজত্ব করেও তারা দেশের মাত্র ১১ শতাংশ হিন্দুকেই মুসলমান করতে সক্ষম হল। এই ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে তৎকালীন মুসলমান পর্যটক আলবেরুনী লিখেছেন,"**হিন্দুরা বিশ্বাস করে যে, তাদের দেশের মত দেশ নেই, তাদের রাজার মত রাজা নেই, তাদের ধর্মের মত ধর্ম নেই, তাদের বিজ্ঞানের মত বিজ্ঞান নেই ইত্যাদি ইত্যাদি**"(5)। তিনি আরও লিখেছেন যে, হিন্দুরা মুসলমানদের যারপর নাই ঘৃণা করত এবং তাদের যবন কিংবা ম্লেচ্ছ বলত। সিংহাসনের অধিকার ও অন্যান্য স্বার্থের কারণে মুসলমানরা নিজেদের মধ্যে যে ছলনা, মিথ্যাচারিতা, বিশ্বাসঘাতকতা ও হানাহানি মারামারি করত, হিন্দুরা তাকে খুবই হীন চোখে দেখত। উপরন্তু মুসলমানদের নিকট আত্মীয়দের মধ্যে বিয়ে শাদীকেও হিন্দুরা অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখত। এই সব কারণে হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করে মুসলমান করা খুবই কঠিন কাজ ছিল(5) ফলে মুসলমানরা বহু হিন্দু হত্যা করেও মুসলমানের সংখ্যা বাড়াতে পারেনি। ভারতকে একটা ১০০ শতাংশ ইসলামী দেশে পরিণত করার উদ্দেশ্য সফল করতে পারেনি।

অপর দিকে গ্রামকে গ্রাম হিন্দু কেটে ফেলার ফলে জমি চাষ করার লোক পাওয়া গেল না। চাষের জমি খালি পড়ে রইল। দেখা দিল আকাল, দুর্ভিক্ষ। কাজেই পরিশ্রম করার লোক হিসাবে হিন্দুদের টিকিয়ে রাখার প্রয়োজন দেখা দিল। মুসলমান বাদশাগণ, তাদের আমির, ওমরাহ্গণ, সেনাপতি ও কাজী উজিরদের বিলাসবহুল জীবন যাপনের রসদ উৎপন্ন করার উৎস হিসাবে হিন্দুদের বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজন দেখা দিল। এই প্রয়োজনের ফলে বর্বর মুসলমানরা তাদের আইন শাস্ত্র ফিক-এর পরিবর্তন করতে বাধ্য হল। হিন্দুদেরও জিজিয়ার বদলে জানমান, সম্পত্তি ও প্রাণরক্ষার অধিকার দিতে হল।

এ ব্যাপারে একটা ঘটনার উল্লেখ করা সঙ্গত হবে। একদিন মুঘিসুদ্দিন নামে এক কাজী সুলতান আলাউদ্দিন খিলজীর রাজ সভায় আসে। আলাউদ্দিন তখন সেই কাজীকে জিজ্ঞাসা করল যে, খরজ গৌজার (বা জিজিয়া প্রদানকারী)

5. R. C. Majumdar, The History & Culture of the Indian People, Bharatiya Vidya Bhavan (in 12 Volume), V, 127.

এবং খরজ দিহ্ (বশ্যতার নিদর্শন স্বরূপ কর প্রদানকারী) হিন্দুদের সঙ্গে ইসলামী শাস্ত্র মুসলমানদের কি রকম ব্যবহার করতে নির্দেশ করে? জবাবে মুখিসুদ্দিন বলে, "তারা হল জিজিয়া প্রদানকারী জিম্মী। জিজিয়া আদায়কারী মুসলমান কর্মচারী তাদের কাছে রৌপ্যমুদ্রা দাবি করলে তাদের উচিত হবে সসম্মানে ও বিনয়ের সাথে স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করা। সেই কর আদায়কারী যদি রেগে গিয়ে তাদের দিকে নোংরা ছুড়ে মারে তবে তাদের উচিত হবে হা করে সেই নোংরা গিলে ফেলা। এভাবেই তারা সেই কর আদায়কারীকে সম্মান দেখাবে। এইভাবে বিনয়ের সাথে কর দিয়ে এবং বিনা প্রতিবাদে নোংরা গিলে তারা বশ্যতার প্রমাণ দেবে এবং এর মধ্যে দিয়েই ইসলামের গৌরব ও মেকি ধর্মের (অর্থাৎ হিন্দু ধর্মের) হীনতা প্রতিষ্ঠিত হবে। স্বয়ং আল্লা তাদের ঘৃণা করেন এবং বলেন, "তাদের সর্বদা পরাধীন করে রাখ"। হিন্দুদের এইভাবে সদা সর্বদা হীন করে রাখাই আমাদের ধর্মীয় কর্তব্য, কারণ তারা আল্লার রসুলের (অর্থাৎ নবী মহম্মদের) চিরস্থায়ী শত্রু। তা ছাড়া আল্লার রসুল আমাদের নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন, "তাদের হত্যা কর, লুণ্ঠন কর এবং তাদের ক্রীতদাসে পরিণত কর।" তিনি বলে গিয়েছেন,"তাদের হত্যা কর অথবা ধর্মান্তরিত কর, তাদের যথাসর্বস্ব লুঠ কর এবং দাসত্ব করতে বাধ্য কর।" ইসলামের মহান টীকাকার হানিফার মত হল,"হিন্দুদের উপর জিজিয়া চাপিয়ে দাও "(অর্থাৎ তাদের জিম্মী হিসাবে গণ্য কর), এবং আমরা সেই মহান হানিফাকেই অনুসরণ করি। অন্যান্য টীকাকারদের মতে হিন্দুদের সামনে দুটো রাস্তা, হয় ইসলাম, নয় মৃত্যু।" (জিয়াউদ্দিন বারনী, তারিখ-ই-ফিরোজশাহী)[6] বিগত ৭০০/৮০০ বছরের মুসলমান পরাধীনতার আমলে হিন্দুরা কি বিড়ম্বনাময় জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়েছে, উপরিউক্ত কথোপকথন তার একটি প্রামান্য দলিল।

উপরিউক্ত জিজিয়া করের সঙ্গে বর্বর মুসলমান শাসকরা বশ্যতার নিদর্শন হিসাবে হিন্দুদের ওপর আরও ২০টা বাধা -নিষেধ আরোপ করেছিল। এগুলো হল—(১) হিন্দুরা কোন নতুন মন্দির তৈরী করতে পারবে না; (২) মুসলমানরা

6. H. M. Elliot & J. Dowson, The History of India as Told By Its Own Historians, Low Price Publications (in Volumes) III, 184-85.

ভেঙ্গে দিয়েছে এমন কোন মন্দির তারা মেরামত করতে বা নতুন করে তৈরী করতে পারবে না ; (৩) যে কোন মুসলমান পথিক কোন মন্দিরে থাকতে চাইলে তাকে সেখানে রাত্রিবাস করতে দিতে হবে ; (৪) কোন মুসলমান কোন হিন্দুর বাড়িতে থাকতে চাইলে, সুস্থ অবস্থায় তিন দিন এবং অসুস্থ অবস্থায় যতদিন ইচ্ছা, আদর যত্নের সাথে থাকতে দিতে হবে ; (৫) কোন হিন্দুকে মুসলমান করা হলে তারা বাধা দিতে পারবে না ; (৬) কোন মুসলমানকে হিন্দু করা হলে যে কোন মুসলমান এই কাজে লিপ্ত ব্যক্তিদের হত্যা করতে পারবে ; (৭) সব মুসলমানকে তারা সম্মান দেখাবে ; (৮) তাদের নিজস্ব কোন আলোচনায় যে কোন মুসলমান ইচ্ছা করলে উপস্থিত থাকতে পারবে ; (৯) কোন হিন্দু মুসলমানের মত পোষাক পরতে পারবে না ; (১০) তারা ইসলামী নাম রাখতে পারবে না; (১১) তারা ঘোড়ায় চড়তে পারবে না ; (১২) তারা কোন অস্ত্র রাখতে পারবে না ; (১৩) মোহর লাগানো যায় এমন কোন আংটি তারা পরতে পারবে না ; (১৪) সব সময় তাদের হীন পোষাক পরে থাকতে হবে ; (১৫) তারা প্রকাশ্যে মদ্যপান করতে পারবে না ; (১৬) তাদের সামাজিক উৎসবাদি মুসলমানদের মধ্যে ছড়াতে পারবে না ; (১৭) তারা মুসলমান এলাকায় বাস করতে পারবে না ; (১৮) হিন্দুর মৃতদেহ তারা মুসলীম কবরখানার কাছে আনতে পারবে না ; (১৯) তারা প্রকাশ্যে ধর্মাচরণ এবং মৃতের জন্য কান্নাকাটি করতে পারবে না এবং (২০) তারা কোন মুসলমান ক্রীতদাস কিনতে পারবে না।[7] বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, সেই সময় আমাদের পূর্বপুরুষদের কি গ্লানিময় পরাধীনতার জীবন কাটাতে হয়েছে।

দার-উল-হার্ব শব্দের আক্ষরিক অর্থহল যুদ্ধ-বিগ্রহের দেশ। বিশেষ অর্থে দার-উল-হার্ব বলতে বোঝায় সেই সমস্ত দেশ যা এখনও ইসলামের পক্ষে জয় করা সম্ভব হয়নি। এবং যেখানে মুসলমানরা সেই দেশের কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে তা নিজেদের দখলে নিয়ে আসার জন্য। এই কারণেই ওই সব দেশকে যুদ্ধ-বিগ্রহের দেশ বলা হয়ে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, এই দেশ ভারতবর্ষ মুসলমান বর্বরদের দ্বারা বিজিত হয়ে এক কালে

---

7. A. Ghosh, The Koran and The Kafirs, 85-86.

দার-উল-ইসলামে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু পরে মারাঠা ও শিখ শক্তির উত্থানের ফলে মুসলমান পরাধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে ভারত একটি দার-উল-হার্ব-এ পরিণত হয়েছে। মুসলমানরা তাদের সংখ্যা বাড়িয়ে, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মুসলমানদের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে, সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের দ্বারা এবং শেষপর্যন্ত পাকিস্তান দ্বারা সামরিক আক্রমণের মাধ্যমে এই দেশকে আবার দার-উল-ইসলামে পরিণত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

বেশির ভাগ হিন্দুই ইসলামের অ আ ক খ ও জানেন না। তারা মনে করেন তাদের হিন্দু ধর্মের মত ইসলাম ও একটি ধর্ম এবং হিন্দু ধর্মের উদ্দেশ্য যেমন মানুষের মধ্যে আধ্যাত্মিক চেতনা গড়ে তোলা এবং তার চরিত্রের উন্নতি ঘটানো , ইসলামেরও বুঝি সেই একই উদ্দেশ্য। কিন্তু প্রকৃত সত্য হল, মানুষের আধ্যাত্মিক চেতনা ও তার চরিত্রের উন্নতির ব্যাপারে ইসলামের বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই। ইসলামের উদ্দেশ্য হল দুনিয়া ব্যাপী ইসলামের এক সাম্রাজ্য গড়ে তোলা। সকলেরই জানা আছে যে, আরব নামক এক মরু দেশে ইসলামের উৎপত্তি হয়েছিল। আজও সেই আরব দেশে চলছে পশুপালব সংস্কৃতি বা pastoral culture। কাজেই সেখানকার নিরক্ষর বর্বরদের পক্ষে সূক্ষ্ম চিন্তা ভাবনা করা বা কোন উচ্চ দর্শন প্রবর্তন করা আজও সাধ্যের বাইরে। উপরন্তু, ইসলামের প্রবর্তক নবী মহম্মদ ছিলেন অশিক্ষিত নিরক্ষর। তাই সেই বর্বর আরব দেশের নিরক্ষর নবীর দ্বারা ইসলাম নামক এক বর্বর তত্ত্বের আবির্ভাবই সম্ভব হয়েছিল, যার সীমা মানুষের আহার, নিদ্রা ও মৈথুন এই তিন পাশব প্রবৃত্তির মধ্যেই আবদ্ধ। এই কারণেই **ইসলামের অন্তিম লক্ষ্য ইহকালে লুঠের মাল ও পরকালে জান্নাৎ নামক আল্লার পতিতালয়।** এই দেশের সাধারণ অশিক্ষিত হিন্দুও আধ্যাত্মিক চেতনায় এত উন্নত যে, তাদের পক্ষে চিন্তা করাই সম্ভব হয় না যে, ধর্মের আড়ালে ইসলামের মত কদর্য, নোংরা, রক্তপিপাসু এক তত্ত্ব থাকতে পারে। ইসলামের মত আহার নিদ্রা ও মৈথুনে সীমাবদ্ধ এক শিশ্নোদর তত্ত্ব ধর্ম নামে প্রচলিত হতে পারে। তাই বেশির ভাগ হিন্দুর পক্ষেই ইসলামের মূল কদর্য চরিত্রটা বুঝে ওঠা সম্ভব হয় না।

আগেই বলা হয়েছে, মূল চরিত্রের দিক থেকে বিচার করলে ইসলাম

কোন ধর্মমত নয়, ইসলাম একটি রাজনৈতিক মতবাদ। এই মতবাদের অন্তিম লক্ষ্য হল পৃথিবীর সমস্ত দার-উল-হার্বকে দার-উল-ইসলামে পরিণত করা এবং এইভাবে সমস্ত পৃথিবীকে ইসলামের পদানত করে বিশ্বব্যাপী ইসলামী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা। তাই কোরাণে আল্লা মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বলছেন, **"তোমরা তাদের (কাফেরদের) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাক, যতদিন না অশান্তি দূর হয় ও আল্লার প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়"** (৮/৩৯)।

ইসলামী তত্ত্ব বলছে, যতদিন পৃথিবীতে অবিশ্বাসী কাফেরদের অস্তিত্ব থাকবে, ততদিন তাদের নিজস্ব দার-উল-হার্বও থাকবে। এবং সেই সব দার-উল-হার্বে মুসলমান ও অমুসলমানদের মধ্যে যুদ্ধ, সংঘর্ষ, রক্তপাত ইত্যাদি (ফিৎনা ফাসাদ) চলতে থাকবে। যত দিন না পৃথিবীর সমস্ত কাফেরকে হত্যা করে নিশিহ্ন করা যাচ্ছে বা ধর্মান্তরিত করে মুসলমান করা যাচ্ছে, তত দিন সংঘর্ষ ও রক্তপাত চলতে থাকবে। যেদিন সমস্ত কাফেরকে কোতল করে পৃথিবীকে কাফের মুক্ত করা যাবে, সে দিনই সব অশান্তি দূর হবে এবং চিরশান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। এই ভাবনার দ্বারা চালিত হয়েই মুসলমান বুদ্ধিজীবীরা ও হিন্দু সেকুলারবাদীরা ইসলামের সঙ্গে শান্তি শব্দটা জুড়ে দেবার অপচেষ্টা করে থাকেন।

কিন্তু এটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে, যেই পথ অবলম্বন করে ইসলাম চিরস্থায়ী শান্তি আনার কথা বলছে সে পথ কত ভয়ঙ্কর। সেই শান্তি আনার প্রক্রিয়া হিসাবে এই পৃথিবীকে বিশাল এক বধ্যভূমিতে পরিণত করতে হবে। কোটি কোটি কাফেরের রক্তে পৃথিবীকে কর্দমাক্ত করতে হবে। মানসিক দিক থেকে কোন সুস্থ ব্যক্তি ইসলামের এই পথকে শান্তি প্রতিষ্ঠার সঠিক পথ হিসাবে স্বীকার করবেন বলে মনে হয় না।

এখানে এটাও বলে রাখা সঙ্গত হবে যে, যদি কোন দিন সমস্ত বিশ্বব্যাপী ইসলামী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে তাও কোন অংশে কম ভয়ঙ্কর হবে না। সেই পরিস্থিতিতে প্রথমত কোরাণ ও হাদিসের জ্ঞান ছাড়া আর সমস্ত জ্ঞান পরিত্যক্ত হবে। ফলে দুনিয়াব্যাপী সমস্ত গ্রন্থাগারে যে সব গ্রন্থরাজি রয়েছে, যার মধ্যে কোরান ও হাদিসের জ্ঞান ভিন্ন অন্য কোন জ্ঞানের আলোচনা আছে, সে সমস্ত গ্রন্থরাজিই বিশাল বহ্ন্যুৎসবের মাধ্যমে জ্বালিয়ে দেওয়া হবে।

দ্বিতীয়ত, কট্টর মৌলবাদী মুসলমান মোল্লা-মৌলবীর দল পৃথিবী ব্যাপী এক শ্বাসরোধকারী স্বেচ্ছাচারী শাসন ব্যবস্থা চালু করবে। এ প্রসঙ্গে আফগানিস্তানের তালিবান সরকারের কাজকর্ম স্মরণ করা চলতে পারে। তৃতীয়ত, মুক্ত চিন্তার দ্বার চিরকালের জন্য রুদ্ধ হয়ে যাবে। বেশিরভাগ খেলাধুলা ও সুকুমার কলা নিষিদ্ধ ঘোষিত হবে।প্রত্যেক পুরুষকে গোঁফ কামিয়ে দাড়ি রাখতে হবে এবং প্রত্যেক মহিলাকে বোরখা দ্বারা শরীর আবৃত করতে হবে। মেয়েদের গৃহবন্দী করে রাখা হবে এবং তাদের পক্ষে শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করা ও অন্যান্য সামাজিক কাজকর্মে অংশ গ্রহণ করা নিষিদ্ধ ঘোষিত হবে। সকলের জন্য ছবি আঁকা, ভাস্কর্য্য, সঙ্গীতচর্চা ইত্যাদি সুকুমার কলা ও সিনেমা, নাটক, টেলিভিশন নিষিদ্ধ করা হবে। অত্যন্ত গোঁড়া মোল্লার দল সর্বত্র কোরাণের মধ্যযুগীয় আইন কানুন চালু করবে। গণতন্ত্র বিদায় নেবে এবং সাধারণ মানুষের মৌলিক অধিকার বলে আর কিছু থাকবে না। শান্তি তখন অবশ্যই বিরাজ করবে, তবে তা হবে শ্মশানের শান্তি।

তৃতীয় সিদ্ধান্ত জিহাদ

আগেই বলা হয়েছে যে, ইসলামের মূল উদ্দেশ্য সমস্ত পৃথিবীকে ইসলামের সাম্রাজ্যে পরিণত করা। সমস্ত পৃথিবীতে ইসলামের পতাকা উড্ডীন করা। কিন্তু কিভাবে, কোন্ পদ্ধতির মধ্য দিয়ে তা করতে হবে? এখানেই ইসলামের তৃতীয় সিদ্ধান্ত জিহাদের আগমন। পাশ্চাত্যের লেখকরা সাধারণত জিহাদের অর্থ করেন পবিত্র যুদ্ধ বা holy war, এবং আমাদের হিন্দু লেখকরা একে বলেন ধর্মযুদ্ধ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইসলামী জিহাদ ধর্মযুদ্ধ বা পবিত্র যুদ্ধ, কোনটাই নয়। সাধারণভাবে হিন্দুরা ধর্মযুদ্ধ বলতে বোঝে ধর্মের সঙ্গে অধর্মের যুদ্ধ বা ধর্মাশ্রিত ন্যায়নিষ্ঠ মানুষের সঙ্গে অন্যায়কারী অসুর প্রকৃতির মানুষের যুদ্ধ। হিন্দুর এই ধর্মযুদ্ধে নারী, শিশু, বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা বা যে কোন অসামরিক ব্যক্তি শুধু অবধ্যই নন্, তাদের বধ করা মহাপাপ। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হিন্দুর ধর্মযুদ্ধের অবধারণার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আজ থেকে প্রায় ৫০০০ বছর আগে, ৩০৬৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ধর্মাশ্রিত পাণ্ডব ও অন্যায়কারী কৌরবদের মধ্যে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল।

যুদ্ধ শুরু হবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে পিতামহ ভীষ্ম যুদ্ধের যে সব নিয়ম কানুন ঘোষণা করেছিলেন তা থেকে হিন্দুর ধর্মযুদ্ধের চরিত্র বোঝা যায়। মহাভারতে ভীষ্ম পর্বের প্রথম অধ্যায়ে ২৭ থেকে ৩২ শ্লোকে এই সব নিয়ম কানুন বর্ণিত হয়েছে। যেমন (১) সন্ধ্যাবেলা যুদ্ধের সমাপ্তি ঘোষিত হলে কোন রকম বৈরিতা থাকবে না। (২) যে ব্যক্তি বাগযুদ্ধে রত রয়েছে, তার সঙ্গে শুধু বাগযুদ্ধই করা যাবে। (৩) রথীর সঙ্গে রথীর, হাতি সওয়ারের সঙ্গে হাতিসওয়ার, ঘোড়সওয়ারের সঙ্গে ঘোড়সওয়ার এবং পদাতিকের সঙ্গে শুধু পদাতিকই যুদ্ধ করবে। (৪) যার যেমন যোগ্যতা, ইচ্ছা, উৎসাহ ও বল, তার সঙ্গে সেই রকম প্রতিপক্ষই যুদ্ধ করবে এবং এ ব্যাপারে উভয়পক্ষই প্রতিপক্ষকে আগে থেকে সাবধান করবে।

কোন্ কোন্ ব্যক্তি অবধ্য সে ব্যাপারে নিয়ম হল, (১) যে ব্যক্তি সাময়িকভাবে যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরে গিয়েছে, (২) যে ব্যক্তি অসাবধান ও অপ্রস্তুত রয়েছে, (৩) যে ব্যক্তি যুদ্ধ দেখে ভয়ে বিহ্বল হয়ে পড়েছে, (৪) যে ব্যক্তি

অন্য এক জনের সঙ্গে যুদ্ধে রত রয়েছে, (৫) যে বশ্যতা স্বীকার করেছে, (৬) যে পিঠ দেখিয়ে পালাচ্ছে এবং (৭) যার অস্ত্র ভেঙে গিয়েছে বা কবচ কেটে গিয়েছে। এ ছাড়া রথের সারথী, অস্ত্রবাহক এবং ভেরী ও শঙ্খবাহক, এরাও অবধ্য। যুদ্ধের এই সব নিয়ম-কানুনের মধ্য দিয়ে তৎকালীন ভারতীয় হিন্দু সমাজের যে সভ্যতার পরিচয় পাওয়া যায় তা বিশ্বের অন্য কোন মানব সমাজের পক্ষে এক অকল্পনীয় ব্যাপার।

কিন্তু ইসলামী জিহাদ হল পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত যত রকম বর্বরতার অনুষ্ঠান হয়েছে তার মধ্যে বর্বরতম ও সর্বাপেক্ষা পাশবিক হত্যালীলা। তিনটি ইংরাজী শব্দের মাধ্যমে জিহাদের বর্বরতাকে বর্ণনা করতে সুবিধা হয়, তা হল-by sword, fire and rape, বা তরবারি, আগুন ও ধর্ষণের মধ্য দিয়ে নারী, শিশু, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা নির্বিশেষে কাফের হত্যা করে তাদের সহায়-সম্বল, ধন-সম্পত্তি লুঠপাট করে তাদের জমি-জায়গা, ঘর বাড়ি দখল করার নামই ইসলামী জিহাদ। তাই কোরাণে আল্লা বলছেন, **"অতঃপর নিষিদ্ধ মাসসমূহ বিগত হলে অংশীবাদী কাফেরদের যেখানে পাবে বধ করবে; তাদের বন্দী করবে, অবরোধ করবে এবং প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের জন্য ওৎপেতে থাকবে। কিন্তু যদি তারা তওবা (অনুতাপ) করে, নামাজ কায়েম করে এবং যাকাৎ দেয় (অর্থাৎ ইসলাম কবুল করে), তবে তাদের পথ মুক্ত করে দিবে;** নিশ্চয়ই আল্লা ক্ষমাশীল ও দয়াময়" (৯/৫)।

আগেই বলা হয়েছে যে, আধ্যাত্মিক বিষয়ে ইসলামের কোন মাথাব্যথা নেই এবং ইসলামের মূল উদ্দেশ্য হল পৃথিবীব্যাপী বিশাল এক ইসলামী সাম্রাজ্য তৈরি করা। যেহেতু জিহাদ হল ওই লক্ষ্য পূরণের সামরিক অঙ্গ, তাই ইসলামে জিহাদের গুরুত্ব অপরিসীম। আল্লা কোরাণ মারফৎ ঘোষণা করে দিয়েছেন যে, **পৃথিবীর সমুদয় সম্পত্তির মালিক আল্লা ও তার রসুল মহম্মদ।** কাজেই পৃথিবীময় কাফেররা যে সব ধন সম্পত্তি, জায়গা-জমি ও বাড়ি ঘর দখল করে আছে তার মালিক হলেন আল্লা ও তাঁর রসুল। তাই সেই সব অবৈধ দখলকারীদের সমূলে বিনাশ করে সেই সব সম্পত্তি আল্লার আওতায় নিয়ে আসতে হবে। সেই কারণে জিহাদ হল ইসলামের সর্বোচ্চ পুণ্যের কাজ। এমনকি জিহাদ মক্কায় হজ করতে যাবার চাইতেও শ্রেষ্ঠ এবং

অন্যান্য কম পুণ্যের কাজ, যেমন নামাজ, রোজা ইত্যাদির তো কোন প্রশ্নই ওঠে না। তাই কোরাণে আল্লা বলছেন, "**তোমাদের জন্য কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বিধিবদ্ধ হল, ইহা তোমাদের কাছে প্রীতিকর বা অপ্রীতিকর হোক না কেন।** তোমরা যা পছন্দ কর না, তা সম্ভবতঃ তোমাদের পক্ষে কল্যাণকর এবং তোমরা যা পছন্দ কর, তা হয়তো তোমাদের পক্ষে অকল্যাণকর" (২/২১৬)।

জিহাদে অংশগ্রহণকারী মুসলমানকে বলে মুজাহিদ (বা আল্লার সৈনিক) এবং বহুবচনে মুজাহিদিন। আল্লার অন্তিম ইচ্ছা হল মুজাহিদদের সাহায্যে পৃথিবীর আর সমস্ত ধর্মকে বিনাশ করে সারা বিশ্বে ইসলামের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করা। এবং মুজাহিদদের সাহায্যে এক দিকে ইসলামের শত্রুদের বিনাশ করা, আবার তাদের সাহায্যেই ইসলামকে রক্ষা করা। তাই কোরাণ বলছে, "**হে বিশ্বাসীগণ, আমি তোমাদের এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দেবো যা তোমাদের মর্মন্তুদ শাস্তি হতে রক্ষা করবে–উহা এই যে, তোমরা আল্লা ও তাঁর রসুলে বিশ্বাস স্থাপন কর, এবং তিনি তোমাদের জান্নাতে দাখিল করবেন**" (৬১/১২)।

মুসলমানদের জিহাদে উদ্দীপিত করতে আল্লা আরও বলছেন, "**আল্লার দৃষ্টিতে জিহাদের সমতুল্য কাজ আর কিছু নেই**" (৯/১৯) এবং "বিশ্বাসীদের মধ্যে যারা অক্ষমতা ব্যতীত ঘরে বসে থাকে, আর যারা আল্লার পথে স্বীয় ধন প্রাণ দ্বারা জিহাদ করে তারা সমান নয়।....যারা ঘরে বসে থাকে তাদের উপর জিহাদকারীদের আল্লাহ মহাপুরস্কারে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন" (৪/৯৫)। "**যে কোন ব্যক্তি, যার পা আল্লার পথে জিহাদ করতে গিয়ে ধূলিমলিন হয়েছে, নরকের আগুন তার জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে** (বোখারি শরীফ-৮/৬৬)। যে সব ব্যক্তি শারীরিক দিক থেকে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও জিহাদে যোগ না দিয়ে ঘরে বসে থাকে,আল্লা তাদের কঠোর ভাষায় তিরস্কার করে বলছেন, "**যদি তোমরা (জিহাদে) বের না হও, তবে তিনি (আল্লা) তোমাদের যন্ত্রণাপ্রদ শাস্তি দিবেন, এবং অপর কোন জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন, তোমরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না**" (৯/৩৯)।

জিহাদে সফল হতে গেলে প্রথমেই দরকার সামরিক শৃঙ্খলা। তাই আল্লা বলছেন, "**যারা আল্লার পথে সারিবদ্ধভাবে সুদৃঢ় প্রাচীরের মত সংগ্রাম করে,**

আল্লা তাদের ভালবাসেন" (৬১/৪)। সামরিক ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ একজন ব্যক্তিই থাকেন, যিনি সর্বোচ্চ আদেশ দেন এবং বাহিনীর সবাই তার আনুগত্য করে। একাধিক ব্যক্তি হলে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। তাই আল্লা সকল জিহাদীকে আল্লার রসুলের আনুগত্য করতে আদেশ দিয়ে বলছেন, "যারা তোমার (আল্লার রসুল মহম্মদের) নিকট আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করে, তারা তো আল্লার আনুগত্যেরই শপথ গ্রহণ করে," (৪৮/১০)। সেই সঙ্গে সঙ্গে আল্লা জিহাদীদের স্বর্গীয় সাহায্য ও বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলছেন যে, তিনি ৫০০০ ফেরেস্তা বা দেবদূতকে জিহাদীদের হয়ে যুদ্ধ করার জন্য পাঠাবেন, যাতে তারা জয়ী হতে পারে (৩/১২৪-১২৫)। "তোমরা শিথিল হয়ো না, ও বিষণ্ণ হয়ো না। তোমরাই সমুন্নত, যদি তোমরা (প্রকৃত) বিশ্বাসী হও" (৩/১৩৯)।

আল্লা আরও বলছেন, "যারা বিশ্বাসী তারা আল্লার পথে যুদ্ধ করে, এবং যারা অবিশ্বাসী তার শয়তানের পথে যুদ্ধ করে, নিশ্চয়ই শয়তান এক দুর্বল চক্রান্তকারী" (৪/৭৬)। "হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা যখন কোন (কাফের) বাহিনীর সম্মুখীন হও, তোমরা অবিচলিত থাকবে এবং মুখে ও মনে আল্লাকে স্মরণ করবে, যাতে তোমরা বিজয় প্রাপ্ত হও" (৮/৪৫)। "যদি আল্লা তোমাদের সাহায্য করেন, তবে তোমাদের উপর কেহ জয়ী হতে পারবে না এবং তিনি যদি তোমাদের পরিত্যাগ করেন তবে কে আর তোমাদের সাহায্য করবে" (৩/১৬০)। "হে নবী, বিশ্বাসীগণকে যুদ্ধে উদ্দীপিত কর, যদি তোমাদের মধ্যে কুড়িজন ধৈর্য্যশীল থাকে, তবে তারা দু'শ জনের উপর জয়ী হবে এবং তোমাদের মধ্যে একশ জন থাকলে তারা এক হাজার জন অবিশ্বাসীর উপর জয়ী হবে" (৮/৬৫)। পক্ষান্তরে জিহাদ করতে এসে জিহাদের ময়দান থেকে ভয়ে পলায়ন করলে আল্লার চোখে তা হবে অতিশয় গর্হিত কাজ এবং তার শাস্তি হবে ভয়ঙ্কর। তাই আল্লা বলছেন, "হে বিশ্বাসীগণ, যখন তোমরা (জিহাদে) অবিশ্বাসীদের সম্মুখীন হবে, তখন তোমরা পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করবে না। যে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে সে হবে আল্লার বিরাগভাজন এবং তার আশ্রয় হবে নরক" (৮/১৫-১৬)।

আল্লার দৃষ্টিতে মুসলমানদের পক্ষে জিহাদ করা হবে দুদিক দিয়ে লাভজনক। প্রথমতঃ যদি তারা জয়লাভ করে এবং প্রাণে বেঁচে থাকে, তা হলে লুঠের মালের ভাগ পাবে। আর যদি জিহাদে মারা যায়, তবে সে হবে শহীদ। মৃত্যুর আগেই আল্লা সেই শহীদদের তাঁর জান্নাতে নিয়ে যাবেন এবং ইন্দ্রিয় সুখের অঢেল ব্যবস্থা করবেন। ইসলামে লুঠের মাল ভাগাভাগি করার ব্যাপারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এই ভাগাভাগি ন্যায্য না হলে বান্দারা জিহাদে উদ্দীপিত হবে না। তাই আল্লা বলছেন, **"প্রত্যেক ব্যক্তি, যা সে (জিহাদের দ্বারা) অর্জন করেছে, তা সে পূর্ণভাবেই পাবে, এবং তারা প্রতারিত হবে না"** (৩/১৬১)। সুতরাং **"তোমরা আল্লার নাম নিয়ে (কাফেরদের) আক্রমণ কর এবং অবিশ্বাসীদের হত্যা কর।.....এবং লুঠের মাল জোগাড় করার মত ভাল কাজ (জিহাদ) কর, কারণ যারা ভাল কাজ (জিহাদ) করে আল্লা তাদের ভালবাসেন"**।

আগেই বলা হয়েছে যে, জিহাদ করতে গিয়ে যারা শহীদ হবে, আল্লার জান্নাতে তারা হবে আল্লার বিশিষ্ট অতিথি। এই ব্যাপারে আল্লা বলছেন, **" যারা আল্লার পথে নিহত হয়েছে, তাদের তোমরা কখনও মৃত মনে করো না। (আল্লার দৃষ্টিতে) তারা জীবিত এবং প্রতিপালকের কাছ থেকে তারা উত্তম জীবিকা প্রাপ্ত হয়ে থাকে"** (৩/১৬৯)। **"যারা পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবন বিক্রয় করতে ইচ্ছুক তারা আল্লার পথে সংগ্রাম (জিহাদ) করুক, এবং কেহ আল্লার পথে সংগ্রাম করলে, সে মরুক বা বাঁচুক, আমি তাকে মহান প্রতিদান দিব"** (৪/৭৪)। কোন মুসলমানের পক্ষে জিহাদে শহীদ হওয়া এতই লাভজনক যে, একজন মুজাহিদ বলবে, **"আমি আল্লার পথে জিহাদ করে শহীদ হব, এবং শহীদ হবার জন্য আবার বেঁচে উঠব এবং শহীদ হব, শহীদ হবার জন্য আবার বেঁচে উঠব এবং শহীদ হব, এবং শহীদ হবার জন্য আবার বেঁচে উঠব"** (বোখারী-৪.৫৪)।

জিহাদে শহীদ হওয়া কত উপকারী ও লাভজনক তা বোঝাতে নবী মহম্মদ বলতেন যে, (১) **শহীদের আত্মা সবুজ পাখী হয়ে স্বর্গে বসবাস করবে এবং**

স্বর্গের যেখানে সেখানে উড়ে বেড়াবে। (২) তাদের সমস্ত গোনা (পাপ) ও কুকর্ম ক্ষমা করা হবে। (৩) কেয়ামৎ বা শেষ বিচারের দিন সেই শহীদ তার ৭০ জন আত্মীয় ও বন্ধুর জন্য আল্লার বিচারে হস্তক্ষেপ করতে পারবে। (৪) কেয়ামতের সেই ভয়ঙ্কর দিনে সে অবিচলিত থাকবে। (৫) সে মৃত্যুর কোন কষ্ট বা যন্ত্রণা অনুভব করবে না। (৬) **কাফেরদের হত্যা করার ব্যাপারে সে কোন অনুতাপ বা দুঃখ ভোগ করবে না।**

বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় যে, জিহাদ ও জিহাদে শহীদ হবার উপরিউক্ত ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গীর ফলেই পাকিস্তান, আফগানিস্তান, সৌদি আরব, ইরাক, প্যালেস্টাইন ইত্যাদি ইসলামী দেশগুলোর হাজার হাজার যুবক যুবতী সন্ত্রাসবাদী ও আত্মঘাতী বোমা বা suicide bomber (ফিদায়িন) হবার জন্য এগিয়ে আসছে। বলতে দ্বিধা নেই যে, জিহাদে শহীদ হবার উপরিউক্ত তত্ত্বের দ্বারা উদ্দীপিত হয়েই গত ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর ১৯ জন মুসলমান যুবক ৪ খানা বিমান ছিনতাই করে ওয়ার্লড ট্রেড সেন্টার ও পেন্টাগনের ওপর হামলা করেছিল। আগেই বলা হয়েছে যে মুসলমান মেয়েরা আল্লার জান্নাতে যাবার অনুমতি পাবে না এবং তাদের প্রায় সবাই নরকের আগুনে স্থান পাবে। স্বর্গে যাবার একটি মাত্র রাস্তা তাদের সামনে খোলা আছে, আর তা হল জিহাদে শহীদ হয়ে। এই কারণে প্যালেস্টাইনের বহু যুবতী আজ আত্মঘাতী বোমার মধ্য দিয়ে শহীদ হবার জন্য এগিয়ে আসছে। অনেকে হয় তো ভাবতে পারেন যে, অশিক্ষিত মুসলমানরাই শুধু এই সব তত্ত্বে বিশ্বাস করে এবং সেই কারণে তাদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ঘটালে ওই সব চূড়ান্ত মৌলবাদী ও অলীক তত্ত্বে তারা বিশ্বাস করবে না। কিন্তু এই ধারণা ঠিক নয়। নামাজ ও কোরাণ মারফৎ এই সব ইসলামী ধ্যান ধারণা মুসলমানদের মর্মে মর্মে এমন ভাবে ঢুকে যায় যে, প্রথাগত শিক্ষা সেই বিশ্বাসকে দুর্বল করতে পারে না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, বর্তমান বিশ্বের সর্বাপেক্ষা কট্টর জিহাদী দানব ওসামা বিন লাদেন একজন ইঞ্জিনীয়ার। বছর খানেক আগে প্যালেস্টাইনের এক যুবতী আত্মঘাতী বোমার বিস্ফোরণে প্রাণ দিয়েছিল এবং ব্যক্তিগত জীবনে সে ছিল বি এস সি-র ছাত্রী এবং মাস

দুয়েক পরে তার নিকাও পাকা ছিল। গত ২০০১ সালের ডিসেম্বরে দিল্লীর সংসদ ভবনে যে সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ হয়েছিল, সেই চক্রান্তে জড়িত ছিল দিল্লীর জহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন মুসলমান অধ্যাপক। সাধারণভাবে এটাই লক্ষ্য করা যায় যে, অশিক্ষিত মুসলমানের চেয়ে শিক্ষিত মুসলমানরা আরও বেশি গোঁড়া ও সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন হয়ে থাকে।

এ ব্যাপারে আরও একটি বিষয় লক্ষ্যণীয়, তা হল নবী মহম্মদ যতদিন মক্কায় ছিলেন ততদিন আল্লা তাঁর বান্দাদের যুদ্ধ করার অনুমতি দেননি। কিন্তু নবীর মদিনায় হিজরৎ করার পর আল্লা প্রথমে মুসলমানদের যুদ্ধের অনুমতি দিলেন এবং কালক্রমে যুদ্ধ করা প্রত্যেক সক্ষম মুসলমানের আবশ্যিক কর্তব্য বলে নির্দেশ করলেন (২/১৯০, ২২/৩৯)। এবং তিনি বললেন, "অতএব যখন তোমরা অবিশ্বাসীদের সাথে যুদ্ধে মোকাবিলা কর, তখন তাদের গর্দানে আঘাত কর। পরিশেষে যখন তোমরা ওদের সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করবে, তখন ওদের কষে বাঁধবে, অতঃপর তোমরা ইচ্ছা করলে ওদের হত্যা করতে পার, অথবা মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দিতে পার। তোমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে যতক্ষণ না তারা অস্ত্র সংবরণ করে।....ইহা এই জন্য যে, আল্লা ইচ্ছা করলে ওদের শাস্তি দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি চান তোমাদের একককে অপরের দ্বারা পরীক্ষা করতে" (৪৭/৪)। কাজেই সব মুসলমানের উচিত যত বেশী সংখ্যক কাফের হত্যা করে আল্লার প্রতি তার আনুগত্য প্রমাণ করা। তারা তখন বলবে, "আল্লা সকল প্রশংসার মালিক, কারণ তিনি অবিশ্বাসীদের সঙ্গে হস্ত, হৃদয় এবং জিহ্বার সাহায্যে যুদ্ধ করার জন্য জিহাদ নামক তত্ত্ব উদ্ভাবন করেছেন এবং তার পুরস্কার স্বরূপ আমাদের জন্য স্বর্গের মনোরম উদ্যান নির্দিষ্ট করে রেখেছেন।"

পৃথিবীর সমস্ত উলেমারা (মুসলমান পণ্ডিতরা) এ ব্যাপারে একমত যে, ইসলামের সর্বোচ্চ আদর্শ হল জিহাদ এবং তা নামাজ, রোজা ও যাকাৎ (ভিক্ষা দেওয়া) থেকে মহান তো বটেই, এমন কি তা মক্কায় হজ্জ করতে যাওয়ার থেকেও মহত্তর। জিহাদ হল সকল রকম উপাসনার সার। তাই

জিহাদকারীর কাছে নামাজ রোজা ইত্যাদি গৌণ ব্যাপার মাত্র, এবং এই **কারণেই আল্লা জিহাদকারীর রোজা মাফ করে দিয়েছেন এবং এক দিনের জিহাদকে এক হাজার দিনের নামাজের সমান করে দিয়েছেন। জিহাদ হল প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য, সমস্ত রকমের উপাসনার সার। জিহাদের মধ্য দিয়েই বান্দা আল্লার প্রতি তার বশ্যতা ও প্রেম প্রকাশ করার সুযোগ পায়।** যে বান্দা জিহাদের প্রতি যতখানি অনুরক্ত, আল্লার প্রতিও সে ততখানিই অনুরক্ত। **আল্লা জিহাদকারীকে যতখানি আশীর্বাদ করেন ও পুরস্কার দেন, তেমন আর কাউকেই করেন না।** কাজেই একজন সক্ষম মুসলমানের সর্বোচ্চ কামনা হল কাফেরদের হত্যা করতে ও তাদের সহায় সম্বল লুটপাট করতে জিহাদে যোগদান করা। এবং সেই কারণে আল্লার সর্বোচ্চ উপাসনা হল জিহাদ করা। **ইসলাম থেকে জিহাদকে বাদ দিলে যা পড়ে থাকবে তার আর কিছু যাই হোক না কেন, ইসলাম নয়।**

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হল, আজ মুসলমান জিহাদীরা সারা পৃথিবীতে যে সন্ত্রাসবাদী কাজকর্ম চালাচ্ছে, সেটাও জিহাদেরই অঙ্গ। এবং উপরিউক্ত জিহাদী তত্ত্ব অনুসারে এই সন্ত্রাসবাদ ইসলামের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং ইসলাম থেকে সন্ত্রাসবাদকে বাদ দিলে তা আর ইসলাম থাকবে না। কিন্তু ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ কিছু কিছু ব্যক্তি এই মত ব্যক্ত করে চলেছেন যে জিহাদী সন্ত্রাসবাদের মূল কারণ অর্থনৈতিক। তাদের মতে মুসলমান যুবকরা ঠিক মত চাকরী বাকরী পাচ্ছে না, তাই তারা সন্ত্রাসবাদের পথে যাচ্ছে। কিন্তু উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, অর্থনীতির মধ্যে জিহাদের কারণ অনুসন্ধান করতে যাওয়া কতখানি মূর্খতার পরিচয়। মুসলমান উলেমারা এ ব্যাপারে খুবই খোলা মেলা। তারা কোন রাখ ঢাক না করেই বলছে যে সন্ত্রাসবাদ ইসলামী জিহাদেরই একটি অঙ্গ। কাজেই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, যত দিন ইসলাম থাকবে, ততদিন ইসলামী সন্ত্রাসবাদও থাকবে। তাই ইসলামী সন্ত্রাসবাদ দূর করার মূল সর্তই হল ইসলামকে সমাপ্ত করা।

এখানে স্মরণ করা কর্তব্য যে, ইসলামের উদ্দেশ্য দুনিয়া জোড়া ইসলামের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা এবং **ইসলাম ছাড়া আর সব ধর্মকে**

শেষ করে আল্লার ধর্মকে পৃথিবীর একমাত্র ধর্ম হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা (কোরাণ- ৮/৩৯)। এই লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য জিহাদ হল পথ বা উপায়। সেই কারণেই আল্লা জিহাদকে ইসলামের সর্ব্বোচ্চ উপাসনা বলে বর্ণনা করছেন এবং নানা প্রলোভনের দ্বারা মুজাহিদদের জিহাদে উদ্দীপিত করে চলেছেন। ইহলোকে লুঠের মাল ও কাফের নারীদের সঙ্গে যৌন সম্ভোগ এবং পরকালে জান্নাৎ নামক আল্লার পতিতালয়ের সর্ববিধ ইন্দ্রিয় সুখের প্রলোভন দেখিয়ে চলেছেন। তাই কোরাণ বলছে, "**তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ (জিহাদ) করে, আল্লা তাদের এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন যে তিনি তাদের এই পৃথিবীর উপর কতৃত্ব (বা প্রভুত্ব) করার অধিকার প্রদান করবেন**" (২৪/৫৫), "**কারণ আমার সৎকর্মশীল (জিহাদকারী) বান্দারাই এই পৃথিবীর অধীশ্বর হবে**" (২১/১০৫), "**কারণ তোমারই মানবমণ্ডলীর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম সম্প্রদায়রূপে উদ্ভূত হয়েছ**" (৩/১১০)।

ভারতের মাটিতে জিহাদের বর্বরতা

যে মুহূর্তে মুসলমান নামক মানব দেহধারী জানোয়ারের দল এই ভারতের মাটিতে পা রাখল, তখন থেকেই এই দেশে শুরু হল ইসলামী জিহাদের বীভৎসতা। এক দিনের মধ্যে লক্ষ লক্ষ হিন্দু কেটে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেওয়া হয়ে গেল এক নিত্যকার ঘটনা। অতীতে ভারতের পশ্চিমে, ইরানের সীমান্ত দিয়ে মুসলমান দানবের দল ভারতে ঢোকার বহু চেষ্টা করেছে। মুসলমানদের দ্বারা ইরান দখল করার পরবর্তী প্রায় ১০০ বছর ধরে এই আক্রমণ চলে। কিন্তু ভারতের সীমান্ত রক্ষাকারী সৈন্যরা সে সব আক্রমণ প্রতিহত করে দেয়। কিন্তু ৭১১ খ্রীষ্টাব্দে আরবের মুসলমান দানব মহম্মদ বিন কাসেম সমুদ্র পথে দেবালয় (আজকের করাচি) হয়ে ভারতে পা রাখতে সমর্থ হয় এবং তখন থেকেই শুরু হয় এই দেশের মাটিতে ইসলামী জিহাদের বর্বরতা।

সিন্ধু দেশের কয়েকটি দুর্গ দখল করার পর মহম্মদ বিন কাসেম তৎকালীন খলিফা আল হাজ্জাজকে চিঠি লিখে জানাল, "শিবিস্থান ও সিশাম-এর দুর্গ আমাদের দখলে এসে গিয়েছে। কাফেরগণকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করা হয়েছে এবং বাকীদের হত্যা করা হয়েছে। পুতুল পূজার মন্দির ভেঙে মসজিদ বানানো হয়েছে।"[8] খলিফা হাজ্জাজের কাছ থেকে জবাব এল, "কাফেরদের প্রতি কোন রকম দয়া দেখানো ইসলাম বিরোধী। তাদের সবাইকে কোতল করতে হবে এবং তাদের নারী ও শিশুদের বন্দী করতে হবে"[9] কারণ ইসলামী নীতি অনুসারে নারী ও শিশুরাও লুঠের মাল এবং এ ব্যাপারে কোরাণ বলছে, ".... **তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যা গ্রহণ করেছে (অর্থাৎ নারী ও শিশু ক্রীতদাস) তা আল্লার দান ও লুঠের মাল হিসাবে গ্রহণ কর"** (৩৩/৫০)।

দেবালয় শহরে মুসলমান জানোয়ারের দল তিন দিন ধরে হত্যা, আক্রমণ, লুণ্ঠন ও ধর্ষণ চালায়। সেখানকার দুর্গ হিন্দু বন্দীতে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। সমস্ত পুরুষ বন্দীকে হত্যা ও নারী বন্দীদের মুসলমানরা নিজেদের মধ্যে বিলি করে। দেবালয়ের প্রধান মন্দির, যার চূড়া এত উঁচু ছিল যে সমুদ্রে বহু দূর থেকে তা

---

8. H. M. Elliot & J. Dowson, ibid, I, 164.
9. H. M. Elliot & J. Dowson, ibid, I, 172.

দেখা যেত। সেই মন্দিরকে মসজিদ বানানো হয় এবং তার চূড়ার গৈরিক পতাকা নামিয়ে ইসলামের পতাকা ওড়ানো হয়। এবং **৩০ হাজার হিন্দু নারীকে ক্রীতদাসী হিসাবে বাগদাদে পাঠানো হয়। পরে ব্রাহ্মণাবাদ থেকে আরও ১ লক্ষ ক্রীতদাস বাগদাদে পাঠানো হয়**[10]। ইসলামী মুলুকের তৎকালীন খলিফা জানোয়ার হাজ্জাজ মারা গেলে দেখা যায় তার কারাগারে তখনও ১,৩০,০০০ হিন্দু নারী ও শিশু বন্দী রয়েছে।

এর প্রায় ৩০০ বছর পরে আর এক মুসলমান জানোয়ার ভারত লুণ্ঠন করতে আসে। ইতিহাসে সে গজনীর মামুদ নামে অধিক পরিচিত। মামুদের প্রধান মন্ত্রী আল উৎবী তার মনিবের দানবীয় কাজকর্ম তারিখ-ই-য়ামিনী গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে গিয়েছে। পুরুষপুর বা আজকের পেশোয়ারে মামুদের দানবীয় হত্যাকাণ্ড বর্ণনা করতে আল উৎবী লিখছে, "বেলা তখনও দুপুর হয়নি, মুসলমান বাহিনী আল্লার শত্রু কাফেরদের শক্তিশালী ঘাঁটি দখল করে নিল। **১৫ হাজার হিন্দু কেটে তাদের দেহ কার্পেটের মত জমিতে বিছিয়ে দেওয়া হল এবং তা জন্তু জানোয়ার ও পাখীদের খাবারের পরিণত হল।** আল্লা আমাদের দখলে এত লুটের মাল এনে দিলেন যা এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার, যার মধ্যে ছিল সুন্দর পুরুষ ও সুন্দরী মহিলা সহ ৫,০০,০০০ ক্রীতদাস। সেদিন ছিল ৩৯২ হিজরীর ৮ই মহরম (২৭ শে নভেম্বর, ১০০১ খ্রীঃ)।[11]

এরপর নন্দনায় লুটের বর্ণনা করতে উৎবী লিখছে, "সুলতান হিন্দুস্থান থেকে মূর্তিপূজা বিদায় করে দেশকে পবিত্র করলেন এবং সব মন্দিরকে মসজিদে রূপান্তরিত করলেন। প্রচুর লুটের মাল সহ সুলতান ফিরে চললেন। **এ ছাড়া এত ক্রীতদাস তার সঙ্গে ছিল যে ক্রীতদাসের দাম সস্তা হয়ে গেল। সাধারণ মুদিখানার মালিকও ক্রীতদাসের মালিক হয়ে গেল**"।[12]

এরপর থানেশ্বরের গণহত্যা বর্ণনা করতে উৎবী লিখছে, "থানেশ্বরের প্রধান ছিলেন খুবই অবাধ্য এবং তাকে শিক্ষা দিতে সুলতান সসৈন্যে উপস্থিত হল।....**এত কাফের কাটা পড়ল যে রক্ত গড়িয়ে নদীতে পড়ল এবং নদীর জল বিবর্ণ ও পানের অযোগ্য হয়ে গেল**[13]। এ ব্যাপারে ফেরিস্তা লিখছে,

---

10. H. M. Elliot & J. Dowson, ibid, I, 179.
11. H. M. Elliot & J. Dowson, ibid, II, 27.
12. H. M. Elliot & J. Dowson, ibid, II, 39.
13. H. M. Elliot & J. Dowson, ibid, II, 40-41.

"মুসলমান বাহিনী গজনীতে ২,০০,০০০ ক্রীতদাস নিয়ে উপস্থিত হল। প্রত্যেক সৈন্য এত ক্রীততদাস ভাগে পেল যে গজনীকে ভারতের একটা শহর বলে মনে হতে লাগল।"(14)

এরপর মামুদ সোমনাথের মন্দির ধ্বংস করে। মন্দিরের শিবলিঙ্গকে ভেঙে টুকরো টুকরো করা হয়। কিছু খণ্ডাংশ গজনীতে নিয়ে গিয়ে সেখানকার জাম-এ-মসজিদের সিঁড়ি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। মন্দির লুঠ করে মামুদ **অন্ততপক্ষে ২০,০০,০০০ স্বর্ণমুদ্রা গজনীতে নিয়ে যায়।** এখানে লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হল, মহম্মদ বিন কাসেম থেকে গজনীর মামুদ পর্যন্ত মুসলমান আক্রমণকারীরা লুটপাট করে আবার দেশে ফিরে যায়। ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপন করে ভারতের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করার কোন অভিপ্রায় ওই সব লুণ্ঠনকারীদের ছিল না। এ ব্যাপারে মহম্মদ ঘোরী হল প্রথম ব্যক্তি যে দিল্লী অধিকার করে ভারতে মুসলমান শাসনের প্রবর্তন করে। কোরাণের জিহাদের তত্ত্ব দ্বারা উদ্দীপিত এই সব মুসলমান নরপশুর দল ভারতের রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করে কি পৈশাচিক নরমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করতে পারে তা বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয়। তাই মহম্মদ ঘোরী থেকে শুরু করে মোগল সম্রাট আওরঙজেবের শাসনকাল পর্যন্ত চলল হিন্দুর এক গ্লানিময় পরাধীনতার ইতিহাস, যার স্থায়ীত্ব ছিল প্রায় ৫৫০ বছর। এই সুদীর্ঘ পরাধীনতার কথা বর্ণনা করতে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "প্রতি নিয়ত বিনাশের আশঙ্কার মধ্যে আমাদের পূর্বপুরুষগণকে শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিবাহিত করিতে হইয়াছে।"

মুসলমান বর্বরদের দ্বারা ভারত দখলের ব্যাপারে ঐতিহাসিক উইল ডুরান্ট বিশ্বের সভ্য জগতকে সতর্ক করার জন্য লিখছেন, **"মুসলমানদের দ্বারা ভারত বিজয় সভ্য জগতের কাছে একটি অত্যন্ত নিরুৎসাহের ঘটনা, কারণ এই ঘটনা এই বার্তা বহন করছে যে, বহুমূল্যবান, মানবিক ও উৎকৃষ্ট সভ্যতা, মুক্ত চিন্তার সংস্কৃতি ও শান্তির পরিবেশ বাইরে থেকে আসা অথবা দেশের মধ্যেই গড়ে ওঠা বর্বরদের দ্বারা যে কোন মুহূর্তে ধ্বংস প্রাপ্ত হতে পারে"।**(15)

---

14. H. M. Elliot & J. Dowson, ibid, II, 28 ?
15. Will Durant, The Story of Civilization (as quoted by J. D. Sen in Juhad in India, p-11).

১১৯২ খ্রীস্টাব্দে মহম্মদ ঘোরী দিল্লী দখল করে এবং ১১৯৪ সালে সে ক্রীতদাস কুতুবুদ্দিনকে সঙ্গে করে রাজা জয়চাঁদের বিরুদ্ধে বেনারস অভিযান করে। পথে জুন মাসে তারা কোল নামক স্থানে লুটপাট চালায় এবং সেই বর্বরতা বর্ণনা করতে হাসান নিজামি তার তাজ-উল-মাসির গ্রন্থে লিখছে, **"তার তরবারির ধার সমস্ত হিন্দুকে নরকের আগুনে নিক্ষেপ করল। তাদের কাটা মুণ্ড দিয়ে আকাশ সমান উঁচু তিনখানা বুরুজ নির্মাণ করা হল এবং কবন্ধগুলো বন্য পশুর খাদ্যে পরিণত হল।"**[16]।

সেখান থেকে কুতুবুদ্দিন কাশীর দিকে অগ্রসর হয় এবং অসনি দুর্গ দখল করে লুটপাট চালায়। মিনহাজ-উস-সিরাজ তার তাবাকৎ-ই-নাসিরি গ্রন্থে লিখছে, "সেখানে এত লুটের মাল পাওয়া গেল যে, তা দেখতে দর্শনকারীর চোখ ক্লান্ত হয়ে পড়ল।" এরপর জয়চাঁদের সঙ্গে কুতুবুদ্দিনের যুদ্ধ হয়। জয়চাঁদ হাতির পিঠে চড়ে যুদ্ধ করছিলেন। হঠাৎ একটা তীর এসে তাঁকে মারাত্মক ভাবে জখম করে এবং তিনি হাতির পিঠ থেকে পড়ে যান। ফলে হিন্দু বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে এবং মুসলমানরা কাশী নগরী দখল করে নেয়। সেখানকার ধ্বংসাত্মক কাজ বর্ণনা করতে মিনহাজ লিখছে, "তারা প্রায় ১০০০ মন্দির ধ্বংস করল"।[17]

১১৯৬ সালে কুতুবুদ্দিন গোয়ালিয়র দুর্গ আক্রমণ করে এবং মিনহাজ লিখছে, "কোরাণ বর্ণিত পবিত্র জিহাদের বাণী অনুসরণ করে তারা তাদের রক্তপিপাসু ইসলামের তরবারি খাপ থেকে বার করে ধর্মের শত্রুদের (অর্থাৎ হিন্দুদের) সামনে তুলে ধরল"।[18] ....**"ইসলামের সেনারা সম্পূর্ণভাবে বিজয়ী হল এবং ১,০০,০০০ কাফের হিন্দুকে তৎক্ষণাৎ নরকের আগুনে পাঠিয়ে দেওয়া হল।....সমস্ত মন্দির ধ্বংস করে সেখানে মসজিদ ও মাদ্রাসা নির্মাণ করা হল।"**[19]

এর পরের বছর কুতুবুদ্দিন গুজরাট অভিযান করে। মাউন্ট আবুর এক গিরিপথে রাজা করণ সিং-এর সাথে মুসলমানদের যুদ্ধ হয়। মিনহাজ লিখছে,

16. H. M. Elliot & J. Dowson, ibid, II, 298 .
17. H. M. Elliot & J. Dowson, ibid, II, 223.
18. H. M. Elliot & J. Dowson, ibid, II, 227.
19. H. M. Elliot & J. Dowson, ibid, II, 215.

"প্রায় ৫০,০০০ বিধর্মী কাফেরকে তরবারির সাহায্যে নরকের আগুনে চালান করা হল এবং তাদের শবদেহের স্তূপ পাহাড়ের সমান উঁচু হয়ে গেল।.... বিশ হাজারেরও বেশি ক্রীতদাস, ২০টি হাতি সহ এত লুটের মাল মুসলমানদের হাতে এল, যা কেউ কল্পনাও করেনি।"[20] এরপর ১২০২ সালে কুতুবুদ্দিন কালিঞ্জর দুর্গ আক্রমণ করে এবং রাজা অজদেও-এর সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ হয়। কুতুবুদ্দিন দুর্গ অবরোধ করে। দুর্গে খাদ্যাভাব দেখা দেয়। তখন হিন্দুরা বাইরে এসে মরণপণ যুদ্ধ করে। মিনহাজ লিখছে, **"সমস্ত মন্দিরকে মসজিদে রূপান্তরিত করা হল, ৫০,০০০ নারী ও শিশুকে ক্রীতদাস হিসাবে পাওয়া গেল এবং হিন্দু সৈন্যদের রক্তে মাটি পিচের মত কালো হয়ে গেল।"**[21]

উত্তর ভারতে যখন এই বর্বরতা চলছে, তখন আর এক মুসলমান জানোয়ার বক্তিয়ার খিলজি বিহারে ইসলামী জিহাদের বর্বরতার অনুষ্ঠান করতে লাগল। **১২০৪ সালে সেই দানব নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস করে।** সেই বর্বরতা বর্ণনা করতে মিনহাজ লিখতে, "Bakhtiyar with great vigour and audacity, rushed to the gate and gained possession of the place. Great plunder fell into the hands of the victors. Most of the inhabitants were Brahmins with shaved heads. They were put to death. ...It was discovered that the whole place was (not a fort but a) place of study. It was then set on fire."—**অর্থাৎ বক্তিয়ার খিলজি এগিয়ে সেই (দুর্গের) দরজায় পৌঁছালো এবং তা দখল করে নিল। সেখানকার বেশিরাভাগ লোক ছিল মুণ্ডিত মস্তক ব্রাহ্মণ (আসলে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী)। তাদের সবাইকে হত্যা করা হল। পরে দেখা গেল পুরো জায়গাটা ছিল একটি বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র। অতঃপর তাতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হল।"**[22]

১২৯৬ থেকে ১৩১৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত দিল্লীর সুলতান ছিল আর এক নরদানব আলাউদ্দিন খিলজী। সোমনাথের মন্দির ধ্বংস করা এই দানবের মহান অপকীর্তিগুলোর মধ্যে অন্যতম। এই বর্বরতা বর্ণনা করতে জিয়াউদ্দিন বারনি তার তারিখ-ই-ফিরোজশাহীতে লিখছে, 'সমস্ত গুজরাট প্রদেশটাই

20. H. M. Elliot & J. Dowson, ibid, II, 230.
21. H. M. Elliot & J. Dowson, ibid, II, 231.
22. H. M. Elliot & J. Dowson, ibid, II, 306.

আলাউদ্দিনের শিকারে পরিণত হল। **গজনীর মামুদ সোমনাথের মন্দির ভেঙে দেবার পর হিন্দুরা সেই মন্দির পুনর্নির্মাণ করেছিল ও নতুন বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করেছিল। সেই মন্দির আবার ভাঙা হল। শিব লিঙ্গ দিল্লীতে নিয়ে গিয়ে তা মসজিদের সামনে রাখা হল যাতে নামাজিরা তাকে পায়ে মাড়িয়ে আল্লার ধর্মকে রোশন করতে পারে।**"[23] গুজরাটে আল্লাউদ্দিনের নরহত্যার বিভীষিকা বর্ণনা করতে আর এক মুসলমান ঐতিহাসিক আবদুল্লা ওয়াসফ লিখছে, "**কাম্বায়ৎ নামক জায়গাটা মুসলমানরা রাতের অন্ধকারে ঘিরে ফেলল এবং কাফেরদের ঘুম থেকে ডেকে তুলল। ইতিমধ্যে মুসলমানরা ডাইনে, বায়ে, সামনে, পিছনে, সবদিকে কাফেরদের কোতল করতে শুরু করল। নদীর স্রোতের মত মানুষের রক্ত বয়ে যেতে লাগল।**"[24]

ওই সব মুসলমান জানোয়ারদের আয়ের একটা অন্যতম উৎস ছিল যুদ্ধবন্দীদের এবং লুট করে আনা হিন্দু নারী ও শিশুদের ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রী করা। দানব আলাউদ্দিন খিলজি গরু, ঘোড়া, ধান ইত্যাদির সাথে ক্রীতদাসদেরও দাম বেঁধে দিয়েছিল। **বালকদের দাম ছিল ২০ থেকে ৩০টাকা। দেখার সৌন্দর্য্য ও কাজ করার দৈহিক ক্ষমতা অনুসারে এই দাম নির্ধারিত হত। সাধারণ একজন বালিকার দাম ছিল ৫ থেকে ১২ টাকা এবং ২০ থেকে ৪০ টাকায় একটি সুন্দরী বালিকা পাওয়া যেত। উচ্চ বংশের সুন্দরী মহিলাদের ক্ষেত্রে দাম উঠে যেত ১০০০ থেকে ২০০০ টাকা।**[25]

আজকের সেকুলারবাদী ও মার্কসবাদী ঐতিহাসিকদের বিচারে মহম্মদ-বিন-তুঘলক ছিল একজন খামখেয়ালী উদ্ভাবক এবং তারা এই সব দিকে পাঠকের দৃষ্টি সরিয়ে ওই দানবের কুকর্মকে আড়াল করে চলেছে। সেই সময় ইবন-বতুতা নামে উত্তর আফ্রিকার এক পর্যটক ভারতে আসেন এবং তাঁর বর্ণনার মধ্য দিয়ে মহম্মদ-বিন-তুঘলকের প্রকৃত চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। এ ছাড়া আল উমরি নামে একজন ঐতিহাসিকের রচনা মাসালিক-ই-অবসর থেকেও ওই দানবের কার্যকলাপের পরিচয় পাওয়া যায়।

---

23. H. M. Elliot & J. Dowson, ibid, II, 42-43.
24. K. S. Lal, History of the Khaljis, 313-15.
25. H. M. Elliot & J. Dowson, ibid, III, 586.

ইবনে বতুতা লিখছেন, "সুলতানের রাজসভায় গিয়ে প্রথম দেখা করার দিনই আমি একটা গ্রাম নজরানা পেলাম, যার বাৎসরিক আয় ছিল ৫০০০ দীনার। **সেই সঙ্গে পেলাম একটা ঘোড়া, ১০টা বন্দী হিন্দু রমণী এবং নগদ ৫০০ দীনার**"(26)। সুলতান প্রসঙ্গে আল-উমরি লিখছে, "কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রার ব্যাপারে সুলতানের উৎসাহ ছিল অসীম।...যুদ্ধ বন্দীর সংখ্যা এত **বেশি ছিল** যে প্রতিদিন হাজার হাজার হিন্দু ক্রীতদাস সস্তা দামে বিক্রী হত।"(27) "**মুসলমানদের** চোখে হিন্দু মেয়েরা ছিল কামনা চরিতার্থ করার যন্ত্র বিশেষ।" আল-উমরি আরও লিখছে, "ক্রীতদাসের দাম এত সস্তা হওয়া সত্ত্বেও অনেক সময় **অভিজাত বংশের সুন্দরী হিন্দু রমণীর জন্য ২,০০,০০০ টাকাও দাম দিতে হত।**"(28) এই সব ব্যাপারে ইবনে-বতুতা একটি ঘটনার বর্ণনা করেছেন, যেখানে তিনি নিজে উপস্থিত ছিলেন। তিনি লিখছেন, "**প্রথমে বন্দী হিন্দু রাজার মেয়েদের উচ্চপদস্ত আমীর ও সম্মাণীয় বিদেশীদের মধ্যে বিতরণ করা হল। অন্যান্য কাফেরদের মেয়েদের সুলতান তার ভাই ও অন্যান্য আত্মীয়দের মধ্যে বিলিয়ে দিল।**"(29)।

দিল্লীতে ফিরোজ শাহ্ কোটলা গ্রাউণ্ড নামে একটা ক্রিকেট খেলার মাঠ আছে এবং যেই জানোয়ারের নামে এই নামকরণ করা হয়েছে তার নাম ফিরোজ শাহ্ তুঘলক। জিয়াউদ্দিন বারনি এই জানোয়ারের ক্রিয়াকলাপ বর্ণনা করতে তারিখ-ই-ফিরোজশাহীতে লিখছে, "**জোর করে তুলে আনা হিন্দু রমণীতে পরিপূর্ণ হারেমে একবার ঢু মারা ফিরোজ শা'র নিত্যকর্ম ছিল।**"২৯a এ ছাড়া আরও একটি বর্ণনা বলছে, "**ফিরোজ শা হিন্দু মেয়েদের বলাৎকার করেই খুশী হত না, তাদের ওপর নারকীয় অত্যাচার করেও সে আনন্দ পেত। এই সব অত্যাচারের মধ্যে ছিল যোনিদ্বারে লাল গরম লোহা ঢুকিয়ে দেওয়া, যোনিদ্বার সেলাই করে বন্ধ করে দেওয়া, অথবা স্তন কেটে ফেল্য, ইত্যাদি**"(30) তজরিয়াৎ-উল-আসর-quoted by S.Sen in Jihad in India, p-26)।

26. H. M. Elliot & J. Dowson, ibid, III, 580.
27. S. A. Razvi, Tughlug Kalin Bharat, I, 189.
28. Tajriat-ul-Asar, (as quoted by J. D. Sen, in Jehad in India, p-26).
29. J. D. Sen, Jinad in India, 27.
30. H. M. Elliot & J. Dowson, ibid, III, 394-35.

১৩৬০ খ্রীস্টাব্দে এই পিশাচ ফিরোজ শাহ উড়িষ্যা আক্রমণ করে। পুরী শহর লুণ্ঠন করে, জগন্নাথের মন্দির অপবিত্র করে এবং জগন্নাথের বিগ্রহ সমুদ্রে ফেলে দেয়। তখন উড়িষ্যার রাজধানী ছিল জাজনগর। সেখানে এসে ফিরোজ শাহ জানতে পারল যে, সেখানকার অধিবাসীরা ভয়ে সমুদ্রতীরবর্তী একটি দ্বীপে আশ্রয় নিয়েছে। **ফিরোজ শাহ তার লোকজন নিয়ে সেই দ্বীপে গেল এবং সেখানে আশ্রয় নেওয়া ১,২০,০০০ হিন্দুকে এক দিনের মধ্যে কোতল করে সমুদ্রে ফেলে দিল।**[31] স্বাধীন ভারতের পক্ষে এটা খুবই লজ্জার বিষয় যে, এই পাষণ্ডের নামে দিল্লীতে একটি রাস্তা ও একটি খেলার মাঠের নাম করণ করা হয়েছে।

যে সব মুসলমান দানব বাইরে থেকে ভারতে এসে গণহত্যা ও লুণ্ঠন করে গিয়েছে তাদের মধ্যে একজন হল তৈমুর লং। এই দানব তার আত্মজীবনী তুজুখ-ই-তৈমুরি তে লিখেছে, "এই সময় আমার মনে ইচ্ছা হল যে কাফেরদের বিরুদ্ধে একটা অভিযান করি, এবং তাদের হত্যা করে গাজী হই।....কিন্তু তখনও আমি মন স্থির করতে পারছিলাম না যে, চীনের কাফেরদের বিরুদ্ধে না ভারতের অংশীবাদী কাফেরদের বিরুদ্ধে অভিযান করব। এই সব ভাবতে ভাবতে আমি কোরাণ খুললাম এবং যে আয়াৎটি আমার নজরে এল তা হল, **"হে নবী, অবিশ্বাসী কাফের ও কপটচারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর এবং ওদের প্রতি কঠোর হও"** (৬৬/৯)। আমার অনুগত অনুচররা তখন বলল যে, হিন্দুস্থান হল অবিশ্বাসী কাফেরদের বাসস্থান। এই ভাবে আল্লার আজ্ঞায় আমি তাদের (হিন্দুদের) বিরুদ্ধে জিহাদ করব স্থির করলাম"।[32]

তৈমুর হিন্দুস্থানে এসে প্রথমে ভাটনির (বর্তমান হনুমানগড়) এ পৌঁছাল। সেখানে "সাহসী ইসলামের সৈন্যরা চতুর্দিক থেকে কাফের হিন্দুদের আক্রমণ করল।....আল্লার ইচ্ছায় আমাদের বিজয় হল। **মুহূর্তের মধ্যে দুর্গের সকল হিন্দুদের হত্যা করা হল এবং এক ঘন্টার মধ্যে ১০,০০০ হিন্দুর মাথা কেটে ফেলা হল। ইসলামের রক্তপিপাসু তরবারি অবিশ্বাসীদের রক্তে ধোয়া হয়ে গেল।**"[33] এরপর সুরসুতি (বর্তমান সিরসা)-র মাটি হিন্দুর রক্তে ভাসিয়ে

31. H. M. Elliot & J. Dowson, ibid, III, 421-22.
32. H. M. Elliot & J. Dowson, ibid, III, 429.
33. Mulfujat-i-Taimuri (as quoted by Elliot & Dowson, ibid, III, 432-33).

নরখাদক তৈমুর জাঠদের আক্রমণ করল। "পিপড়ের মতই জাঠরা সংখ্যায় ছিল অগুন্তি ।....আমরা মাঠে ও জঙ্গলে তাদের তাড়া করে গেলাম এবং **প্রায় ২০০০ জাঠ কাটা পড়ল। আমি তাদের স্ত্রীও শিশুদের বন্দী করলাম।"**[34]

এরপর তৈমুর যমুনার পারে, দিল্লীর বিপরীতে, লোনি শহরে উপস্থিত হল। সেখানে হিন্দু মুসলমান, উভয়েরই বাস ছিল। তৈমুর মুসলমানদের ক্ষতি করল না। বেছে বেছে হিন্দুদের হত্যা করল। "**অনেক রাজপুত তাঁদের স্ত্রী ও পুত্র কন্যাদের ঘরে বন্ধ করে ঘরে আগুন দিল, তারপর তারা প্রাণ উৎসর্গ করার জন্য যুদ্ধ ক্ষেত্রের দিকে ছুটল।....তারা শয়তানের মত যুদ্ধ করল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মারা পড়ল। অনেক বন্দী হল। পরদিন আমি মুসলমান বন্দীদের আলাদা করতে বললাম এবং তারপর হিন্দু বন্দীদের ইসলামের তরবারির সাহায্যে নরকের আগুনে পাঠিয়ে দেওয়া হল।** আমি আদেশ দিলাম মুসলমানদের ঘরবাড়ি কোন ক্ষতি না করে কাফেরদের ঘরবাড়ি লুট করে তারপর আগুন দিতে"।[35]

এই সময় তৈমুরের আমিররা খবর দিল যে এত দিনে প্রায় ১ লক্ষ হিন্দুকে বন্দী করা হয়েছে এবং তারা শিবিরেই আছে। তৈমুরের বাহিনী তখন দিল্লী আক্রমণ করতে অগ্রসর হচ্ছিল। তৈমুর তার আমিরদের কাছে বন্দীদের ব্যাপারে পরামর্শ চাইল। তারা বলল যে, এই যুদ্ধকালীন সময়ে ১ লক্ষ শত্রু পিছনে রেখে দিল্লী আক্রমণ করা ঠিক হবে না। অপরদিকে কোরাণের নির্দেশ অনুসারে এত কাফেরকে মুক্ত করে দেওয়াও ঠিক হবে না। "**প্রকৃতপক্ষে এই ১ লক্ষ কাফেরকে তরবারির খাদ্য বানানো ছাড়া আর কোন রাস্তাই পাওয়া গেল না"। তৈমুর তখন ওই এক লক্ষ হিন্দুকে হত্যা করার আদেশ দিল এবং তার সৈন্যরা এক দিনের মধ্যে ওই ১ লক্ষ হিন্দুকে কেটে যমুনায় ফেলে দিল। ফলে যমুনার জলপ্রবাহ বন্ধ হয়ে গেল। দুদিন পড়ে সব মৃতদেহ পচে সমস্ত পরিবেশ বিষাক্ত করে তুলল। যমুনার জল পানের অযোগ্য হয়ে গেল।**[36]

দিল্লীর ঘটনা বর্ণনা করতে তৈমুর তার আত্মজীবনীতে লিখছে," মাসের ৬

34. H. M. Elliot & J. Dowson, ibid, III, 435-36.
35. H. M. Elliot & J. Dowson, ibid, III, 445-46.
36. H. M. Elliot & J. Dowson, ibid, III, 459.

তারিখে আমি দিল্লী দখল করলাম। **হিন্দুরা তাদের স্ত্রী ও পুত্র কন্যাদের ঘরে বন্দী করে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে যুদ্ধ করতে চলে এল এবং শেষ পর্যন্ত মারা পড়ল।** ....পরদিন শুক্রবার **আমি দিল্লীবাসী কাফেরদের ঘরে লুণ্ঠন ও হত্যা করার জন্য ১৫ হাজার তুর্কীকে নিযুক্ত করলাম।** তাদের প্রত্যেকে এত লুঠের মাল আনল যা এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার। সেই সঙ্গে প্রত্যেকে ৫০ থেকে ১০০ টা করে বন্দী নিয়ে এল। এত নারী বন্দী পাওয়া গেল যে গুণে শেষ করা সম্ভব নয়। **মুসলমান ছাড়া আর সকল হিন্দুকে কোতল করা হল।**''(37)

সেই সময় হরিদ্বারে কুম্ভ মেলা বসেছিল এবং স্বভাবতই বহু হিন্দু সেখানে স্নান করতে উপস্থিত হয়েছিলেন। ঘাতক জল্লাদ তৈমুর তার বাহিনী নিয়ে সেখানে উপস্থিত হল। ''আমার সৈনারা বহু হিন্দুকে হত্যা করল এবং যারা ধারে কাছে পাহাড় পর্বতে গিয়ে লুকিয়েছিল, তাদের পিছনে ধাওয়া করল। তাদের অনেকেই কাটা পড়ল। এই ভাবে সবাইকেই নরকে পাঠিয়ে দেওয়া হল এবং রক্তের ধারা পাহাড় থেকে জমিতে এবং তারপর গঙ্গায় মিশে গেল''।(38)

সুলতান নাসিরুদ্দিনের সেনাপতি উলুঘ খাঁ (পরে এই জানোয়ারটা গিয়াসুদ্দিন বলবন নাম নিয়ে দিল্লীর বাদশা হয়) হিমালয়ের পাদদেশে গাড়োয়াল অঞ্চলে যায় এবং তার **সৈন্যদের হুকুম দেয় যে, কেউ একটা জ্যান্ত কাফের ধরে আনতে পারলে ২ টাকা এবং কাফেরের একটা কাটা মুণ্ড আনতে পারলে ১ টাকা বখশিস পাবে। ক্ষুধার্ত কুকুরের মত মুসলমান সৈন্যরা কাফেরের খোঁজে আশেপাশের হিন্দু বসতিগুলোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। দীর্ঘ ৩ সপ্তাহ ধরে সেই কোতল পর্ব চলতে থাকে। হিন্দুর কাটা মুণ্ড ও কবন্ধের স্তূপ পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে যায়।**

আজ ইতিহাস বইতে লেখা হচ্ছে যে ফতেপুর সিক্রির দুর্গ প্রাসাদ অট্টালিকা, সব কিছুই তৈরি করেছে বাদশা আকবর। প্রকৃত পক্ষে তা রাজা সংগ্রাম সিংহের দুর্গ ছিল। ওই দুর্গের পার্শ্ববর্তী প্রান্তরে ১৫২৭ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই মার্চ রাজপুতদের সঙ্গে বাবরের মোগল বাহিনীর যুদ্ধ হয়, যা ইতিহাসে

---

37. P. N. Oak, Islamic Havoc in Indian History, 144.
38. H. M. Elliot & J. Dowson, ibid, IV, 272.

খানুয়ার যুদ্ধ নামে পরিচিত। সকাল থেকে শুরু করে ১০ ঘন্টা তুমুল যুদ্ধের পর যুদ্ধের ফলাফল যখন সম্পূর্ণভাবে রাজপুতদের পক্ষে , এমন সময় সংগ্রাম সিংহ গুরুতরভাবে আহত হলেন। ফলে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তাকে বিদায় নিতে হল। সেই কারণে রাজপুতদের মনোবল ভেঙে গেল এবং যুদ্ধের গতি বাবরের পক্ষে চলে গেল। এ ব্যাপারে বাবর তার আত্মজীবনী তুজুক-ই-বাবরীতে লিখছে, "শত্রুকে পরাজিত করার পর আমরা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলাম এবং ব্যাপকভাবে হত্যা করতে থাকলাম।" প্রকৃত ঘটনা হল, **যুদ্ধ শেষ হলে বাবর গণহত্যার (কোৎল-এ-আম) আদেশ দেয় এবং মুহম্মদি ও বাবরের অন্যান্য সেনাপতিরা ১,০০,০০০ বা তারও বেশি রাজপুত সৈন্য এবং কম করে আরও ১,০০,০০০ অসামরিক হিন্দু কেটে রক্ত গঙ্গা বইয়ে দেয়। এই ঘটনার পরে রাজপুতরা ফতেপুর সিক্রি পরিত্যাগ করে এবং ক্রমে তা বন জঙ্গলে ঢাকা পড়ে যায়।** পরে আকবর সেই বনজঙ্গল সাফ করে তাকে আবার বাসযোগ্য করে তোলে এবং মুসলমান তোষণের যে সেকুলার রাজনীতি এই দেশে চলছে, সেই রাজনীতির বশংবদ ঐতিহাসিকরা লিখে চলেছেন যে ফতেপুর সিক্রি আকবরের তৈরি ।

অন্যান্য মুসলমান আক্রমণকারীদের মত বাবরও ছিল একটি জানোয়ার এবং বহু হিন্দুর গণহত্যা, হিন্দু মন্দির ও হিন্দু বিগ্রহ ধ্বংস করার মত বর্বরতার বহু স্বাক্ষর সেই পাষণ্ড রেখে গিয়েছে। বাবরের আদেশে তার সেনাপতি মীর বাকি অযোধ্যায় রামজন্মভূমি মন্দির ভেঙ্গে তাকে মসজিদে রূপান্তরিত করে। তা ছাড়া বাবর গোয়ালিয়রের নিকটবর্তী উভরের বিখ্যাত জৈন মন্দির ও বিগ্রহ ধ্বংস করে।[39]

গুরু নানক দস্যু বাবরের সমসাময়িক ছিলেন। জানোয়ার বাবরের পৈশাচিক হিন্দু হত্যা, হিন্দু নারী ও শিশুদের প্রতি তার পশুর মত ব্যবহার ইত্যাদি আরও অনেক বর্বরতা গুরু নানক স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ১৫২১ সালে বাবর তৃতীয়বার যখন ভারতে হানা দেয়, গুরুনানক তখন লাহোর থেকে ৮০ কিমি দূরে গুজরানওয়ালা জেলার সৈয়দপুর (বর্তমান অমিনাবাদ)-এ অবস্থান করছিলেন। পাঞ্জাবের স্বাধীনচেতা গক্করদের তাড়া খেয়ে বাবর উত্তরে পালায়।

39. R. C. Majumdar, ibid, BVB, VII, 307.

প্রথমে শিয়ালকোট ও পরে সৈয়দপুর দখল করে বাবর গণহত্যার আদেশ দেয়। ফলে লক্ষ লক্ষ হিন্দু কাটা পড়তে থাকে এবং লক্ষ লক্ষ হিন্দু নারীও শিশু বন্দী হয়। জানোয়ার বাবরের এই সব পশুসুলভ কাজ গুরু নানকের কোমল হৃদয়কে অতিশয় ব্যথিত করে। তিনি লিখলেন,

"হে সৃষ্টি কর্তা ভগবান, জীবন্ত যম হিসাবে তুমি কি দানবরূপী এই বাবরকে পাঠিয়েছ ? অমানুষিক তার অত্যাচার, পৈশাচিক তার হত্যালীলা। অত্যাচারিতদের বুকফাটা আর্তনাদ ও করুণ ক্রন্দন তুমি কি শুনতে পাও না ? তাহলে তুমি কেমন দেবতা"।[40]

এহেন বর্বর, নৃশংস কসাই বাবর সম্বন্ধে আমাদের তথাকথিত সেকুলার ঐতিহাসিকরা তাদের মুসলমান তোষণের নীতি অনুসরণ করে লিখে চলেছেন যে, বাবর তৎকালীন নৃপতিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিল। তার চরিত্রে ৮টি বিশেষ গুণ ছিল, যেমন বিচক্ষণতা, মহৎ উচ্চাশা, যুদ্ধ নিপুণতা, সুদক্ষ শাসন ক্ষমতা ইত্যাদি ইত্যাদি। তারও উপরে বাবর নাকি ছিল শিল্প ও সঙ্গীতানুরাগী এবং কবি। অথচ আসল কথা হল, **লম্পট বাবর বাবরি নামে গজনীর এক কিশোর বালকের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে এবং তাকে নিয়ে ফার্সীভাষায় কবিতা লেখে।** অন্যান্য যে সব গুণের ফিরিস্তি আমাদের ঐতিহাসিকরা দিয়ে চলেছেন, জল্লাদ ও ঘাতক বাবরের মধ্যে তা থাকা কতখানি সম্ভব তা পাঠকের বিচার্য।

অপর যে মুঘল শাসকের গুণের বর্ণনা আমাদের মেরুদণ্ডহীন, গোলামী করতে করতে ভেড়া বনে যাওয়া ঐতিহাসিকরা পাতার পর পাতা ধরে লিখে চলেছেন, সেই লম্পট ও ঘাতক জল্লাদের নাম হল আকবর। তার নামের আগে লেখা হয় মহামতি। অর্থাৎ সেই লম্পট ছিল নাকি সম্রাট অশোকের মতই মহান। প্রকৃত সত্য হল আকবরের হারেমে যে ৫০০০ রমণী ছিল এবং মীনা বাজার নামক নারী বিক্রীর যে হাট আকবর বসাতো আমাদের ঐতিহাসিকরা সযত্নে তা এড়িয়ে চলেন। এবং স্বাভাবিকভাবেই ওই সব হারেমবাসিনীদের মধ্যে প্রায় সকলেই ছিল হিন্দু।

এই সব মেরুদণ্ডহীন ঐতিহাসিকরা আকবরের হিন্দু রমনী বিবাহ করাকে তার মহত্ত্বের আর একটি নিদর্শন বলে দেখাতে চেষ্টা করেন এবং বলেন এটা

40. R. C. Majumdar, ibid, BVB, VII, 306.

প্রমাণ করে যে আকবর ধর্মের ব্যাপারে উদার ছিলেন। কিন্তু যদি তাই হত তবে আকবর অবশ্যই হিন্দু রাজাদের সঙ্গে মুসলমান রমনীদের বিবাহ দেবার চেষ্টা করত। কিন্তু সেরকম কোন দৃষ্টান্ত ইতিহাসে নেই। প্রকৃত সত্য হল, **যে সব হিন্দুরাজা আকবরের বশ্যতা স্বীকার করতেন, সেই বশ্যতার নিদর্শন হিসাবে আকবরকে তার পছন্দমত সেই রাজবংশের একজন কুমারীকে উপঢৌকন দিতে বাধ্য থাকতেন।** এবং সন্ধির চুক্তিপত্রেই তার উল্লেখ থাকত। উদাহরণস্বরূপ রণথম্ভোর দূর্গের তৎকালীন অধিকর্তা ও বুন্দি বংশের প্রধানের সঙ্গে আকবরের যে চুক্তি হয় তা উল্লেখ করা যেতে পারে। সেই চুক্তিপত্রে লেখা হয়েছিল, "....The Chief of Bundi was exempted from the custom degrading to Rajputs to send a bride to the Royal Harem." অর্থাৎ রাজপুতদের হীনতার চিহ্ন হিসাবে রাজকীয় হারেমে একটি বধূ পাঠানোর যে রীতি আছে, তা থেকে বুন্দি প্রধানকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল।"[41]

এ ব্যাপারে সবসময় এটা খেয়াল রাখতে হবে যে, আকবর ছিল কোরানের জিহাদের তত্ত্বে উদ্বুদ্ধ অন্যান্য মুসলমান শাসকের মতই একজন ঘাতক। আহত হিন্দু সম্রাট বিক্রমাদিত হেমরাজ (যাঁকে আমাদের মেরুদণ্ডহীন ঐতিহাসিকের দল তাচ্ছিল্লভরে হিমু লেখেন)-কে আকবরের সামনে আনা হয় তখন **১২ বছরের কিশোর আকবর নিজে হাতে অবলীলাক্রমে তাঁর দেহ থেকে মাথাটা আলাদা করে দেয়। কারণ নিজহাতে ওই কাফেরকে খুন করলে সে গাজী হতে পারবে।**[42]

চিতোর দুর্গ অধিকার করতে আকবরকে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। তাই দুর্গ দখল করার পর আকবর গণহত্যার আদেশ দিল। স্ত্রী পুরুষ, নারী শিশু, যুবক বৃদ্ধ নির্বিশেষে রাজপুত কাটা পড়ল। **কত হিন্দুকে সেদিন দানব কসাই আকবর হত্যা করেছিল? আবুল ফজলের মতে তা ৩০,০০০। আমাদের ঐতিহাসিকদের মধ্যে কারও মতে ৩০,০০০, আবার কারো কারো মতে ৪০,০০০। যাই হোক, অত মৃতদেহ কারও পক্ষে গুণে দেখা সম্ভব ছিল না। ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথের মতে আকবর সব মৃতদেহ থেকে পৈতা খুলে**

---

41. R. C. Majumdar, ibid, BVB, VII, 116.
42. H. M. Elliot & J. Dowson, ibid, V, 65-66.

আনার হুকুম দেয় এবং সেই সংগৃহীত পৈতার স্তূপ ওজন করা হয়। ওজন হয়েছিল সাড়ে চুয়াত্তর মন। কাজেই অনুমান করা চলে যে, কত লক্ষ পৈতা একত্র করলে ৭৪১/২ মন হতে পারে। এর পর রাজপুতরা চিতোর দুর্গ পরিত্যাগ করে এবং ফতেপুর সিক্রির মত চিতোর দুর্গও বনজঙ্গলে ছেয়ে যায়।(43)

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হল, আল্লার নির্দেশকে মান্য করেই আকবর নিহত কাফেরদের শবদেহ গুণে দেখার কোন উৎসাহ দেখায়নি। আরও লক্ষ্য করার বিষয় হল, চিতোর থেকে আকবর খালিপায়ে সোজা চলে যায় ফতেপুর সিক্রিতে, গুরু সুফি ফকির সেলিম চিস্তিকে শুভ সংবাদ দেবার জন্য। এবং সেলিম চিস্তিও ব্যাপক সংখ্যক হিন্দুকে নরকে পাঠানোর সংবাদে প্রসন্ন হয়। অনেক ঐতিহাসিকের মতে আকবর ও জাহাঙ্গীরের আমলে ৬ থেকে ৭ লক্ষ হিন্দুর গণহত্যা করা হয়।

১৫৭৬ সালে হলদিঘাটের প্রান্তরে রাণা প্রতাপ সিংহের সাথে আকবরের যখন যুদ্ধ হয়েছিল, তখনকার একটা ঘটনা এ প্রসঙ্গে বর্ণনা করা সঙ্গত হবে। সেই সময় মান সিংহের রাজপুত সৈন্যরা আকবরের হয়ে যুদ্ধ করছিল। তখন আকবরের এক সেনাপতি বদায়ুনি আর এক সেনাপতি আসফ খাঁ কে বলল, কে যে কোন দিকের রাজপুত তা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে। **তখন আসফ খাঁ ওকে বলল, রাজপুত মারতে থাক। যে দিকের রাজপুতই মরুক না কেন, তাতে ইসলামেরই লাভ।**(44)

এই প্রসঙ্গে আরও একটা ঘটনার উল্লেখ করা দরকার, যাতে হিন্দু পাঠকের পক্ষে মুসলমানের চরিত্র বুঝতে সুবিধা হবে। **প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বৃটিশের ভারতীয় বাহিনীকে ক্রিমিয়াতে পাঠানো হয়। সেই যুদ্ধে বৃটিশের বিপক্ষে ছিল তুরস্কের মুসলমান বাহিনী। ভারতীয় বাহিনীতে হিন্দু ও মুসলমান দুই-ই ছিল এবং হিন্দু বাহিনী আগে এবং মুসলমান বাহিনী পিছনে ছিল। কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল মুসলমান সৈন্যরা তুরস্কের মুসলমান সৈন্যদের আঘাত না করে আপন বাহিনীর হিন্দু সৈন্যদের পিছন থেকে গুলি করে মেরে**

---

43. R. C. Majumdar, H. C. Raychaudhuri & K. Datta, An Advanced History of India, MacMillan & Co. (1980) 443.

44. V. A. Smith, Akbar The Great Moghal, Oxford Clarendon Press, 91 and R. C. Majumdar, ibid, BVB, VII, 334, 122.

ফেলেছে।[45]

এই রকম আর একটি ঘটনা বিশিষ্ট মার্কসবাদী নেতা শ্রীকল্যাণ দত্ত তাঁর "আমার কমিউনিষ্ট জীবন" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। গত ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগষ্ট শুক্রবার কলকাতার মুসলমানরা হঠাৎ হিন্দুদের আক্রমণ করে হত্যা করতে থাকে, যা "গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং" নামে খ্যাত। সেই সময় খিদিরপুর ডক -এর মুসলমান শ্রমিকরা খিদিরপুর ডকেরই হিন্দু শ্রমিকদের আক্রমণ করে হত্যা করতে থাকে। হিন্দু শ্রমিকরা তখন মুসলমান শ্রমিকদের বলে, তোমরা ও আমরা একই সংস্থায় কাজ করি। তা ছাড়া আমরা একই ইউনিয়নের সদস্য। তোমারাও কমরেড, আমরাও কমরেড। তাই আমাদের হত্যা করা তোমাদের উচিত হচ্ছে না। কিন্তু সেই হিন্দু শ্রমিকরা জানতো না যে, মুসলমানদের পক্ষে শ্রমিক শ্রেণীর সমাজতন্ত্রের চাইতে আল্লার আদেশে কাফের হত্যা করে ভারতকে দার-উল-ইসলাম বানানো আরও বেশী জরুরী।[46]

ঔরঙজেবের সময় হিন্দু ধর্মের ওপর যে আক্রমণ হয়েছে তা খুবই ভয়াবহ। তার আদেশেই মথুরার কৃষ্ণ জন্মভূমির কেশবরায় মন্দির ও কাশীর বিশ্বনাথ মন্দির ভাঙ্গা হয়। দুরাত্মা ঔরঙজেব কাশী ও মথুরার মন্দির সহ হাজার হাজার হিন্দু মন্দির ধ্বংস করে। কিন্তু আজকের মুসলমান তোষণকারী সেকুলার রাজনীতির উচ্ছিষ্টভোজী ঐতিহাসিকরা লিখছে যে, ঔরঙজেব মন্দির ধ্বংস করেছিল কিনা তা বিতর্কের বিষয়। তাই ঐতিহাসিক শ্রীরমেশ চন্দ্র মজুমদার লিখছেন, "ঔরঙজেবের মন্দির ধ্বংস করার নীতি যদি বিতর্কিত বিষয় হয় তবে আজকের মানব ইতিহাসে একটিও বিষয় পাওয়া যাবে না যাকে বিতর্কের উর্ধ্বে বলা যেতে পারে"।[47]

ওই সব ভাঙ্গা মন্দিরের বিগ্রহদের কি করা হয়েছিল? সে ব্যাপারে মুসলমান ঐতিহাসিক সাকি মুস্তাইদ খাঁ লিখছে, "জংলী (Pagan) সেই সব মন্দির থেকে মূল্যবান রত্ন খচিত যে সব বিগ্রহ পাওয়া গেল সেগুলোকে আগ্রায়

45. R. C. Majumdar, ibid, BVB, VII, 312.

46. The India Office Library, UK, MSS No. 2397 (as quoted by J. D. Sen, ibid, 42).

47. Kalyan Datta, Amar Communist Jivan, p-20 (as quoted by J. D. Sen, ibid, 42-43).

আনা হল এবং সেখানে নবাব বেগম সাহেবার (অর্থাৎ জাহানারার) মসজিদের সিঁড়ির নীচে ফেলে রাখা হল, যাতে সত্য ধর্মে বিশ্বাসীরা (মসজিদে যাওয়া আসার সময়) সেগুলোকে চিরকাল পায়ের তলায় মাড়িয়ে যেতে পারে"।[48]

সাকি মুস্তইদ খাঁ আরও লিখছে,"রবিউল আখির মাসের ২৪ তারিখে খান জাহান বাহাদুর কয়েক গাড়ি হিন্দু বিগ্রহ নিয়ে যোধপুর থেকে ফিরল। সেখানকার অনেক মন্দির ভেঙে ওই সব বিগ্রহ সংগ্রহ করা হয়েছিল। সোনা, রুপা, পিতল, তামা বা পাথরের তৈরী এই সব বিগ্রহের বেশির ভাগই মহামূল্য রত্নখচিত ছিল। **সম্রাটের হুকুম হল, কিছু বিগ্রহ জঞ্জাল হিসাবে এখানে সেখানে ফেলে রাখতে, বাকীগুলোকে মসজিদের সিঁড়ি হিসাবে ব্যবহার করতে, যাতে বিশ্বাসীরা মসজিদে যাতায়াতের পথে সেগুলোকে মাড়াতে পারে।"[49] কথিত আছে যে, পরে পাথরের মূর্তিগুলোকে ভেঙে খোয়া করা হয় এবং সেই খোয়া দিয়ে দিল্লীর জাম-ই-মসজিদের চাতাল মোজাইক করা হয়, যাতে নামাজীরা ওই সব বিগ্রহকে মাড়িয়ে নামাজ করে আল্লার নাম রোশন করতে পারে।**

সাকি মুস্তইদ খাঁ আরও লিখছে, "১০৯০ হিজরীর ১২ই জিলহজ (৬ই জানুয়ারী, ১৬৮০ খ্রীঃ) যুবরাজ মহম্মদ আজম ও খানজাহান বাহাদুরকে উদয়পুর যাবার অনুমতি দেওয়া হল। রুহুল্লা খাঁ ও ইক্কাতাজ খাঁকে সঙ্গে করে তারা হিন্দু মন্দির ভাঙ্গার জন্য সেখানে রওনা দিল। মন্দিরগুলো ছিল সে যুগের বিস্ময় । কাফেররা গায়ের রক্ত জল করে বহুঅর্থব্যয়ে সেই সব মন্দির নির্মাণ করেছিল।"[50] **কুড়িজন রাজপুত যুবক মন্দির রক্ষার্থে প্রাণ বিসর্জন দিতে সঙ্কল্প করে। বর্বর মুসলমানদের সঙ্গে তাঁরা পরম বিক্রমে যুদ্ধ করতে থাকেন এবং বহু মুসলমান জানোয়ারকে হতাহত করে প্রাণ দেন। "শেষে মন্দির মুক্ত হলে অগ্রবর্তী লোকেরা (অর্থাৎ মুসলমানরা) মন্দিরের বিগ্রহ ও মন্দির ধ্বংস করল।"[51]** সফর মাসের ১লা তারিখে মহামান্য সম্রাট (ঔরঙজেব) চিতোর যাত্রা করলেন এবং সেখানে ৬৩টি মন্দির ভাঙ্গা হল"।[52]

---

48. R. C. Majumdar, ibid, BVB, VII. xii.
49. H. M. Elliot & J. Dowson, ibid, VII, 185.
50. H. M. Elliot & J. Dowson, ibid, VII, 1876.
51. H. M. Elliot & J. Dowson, ibid, VII, 188.
52. H. M. Elliot & J. Dowson, ibid, VII, 235.

"তার অনুচরেরা আশেপাশের আরও১২২টি মন্দির ধ্বংস করে"।[53] ঔরঙজেব নামক দানবের মন্দির ভাঙার ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে ঐতিহাসিক জে. এন. চৌধুরী লিখছেন, "**সমস্ত সাম্রাজ্যের অসংখ্য মন্দিরের সাথে ঔরঙজেব বেনারসের বিখ্যাত বিশ্বনাথ মন্দির (১৬৬৯ খ্রীঃ) এবং মথুরার কৃষ্ণ জন্মভূমির বিখ্যাত কেশব রায় মন্দির বা ডেরা কেশু রায় এবং পাটনের বিখ্যাত সোমনাথের মন্দির ধ্বংস করে।**

অনেক সময় অনেক মূর্খ হিন্দু মুসলমানদের পরামর্শ দেন, "তোমরা নিষ্ঠাবান মুসলমান হও"। তাঁরা মনে করেন যে, কোন মুসলমান নিষ্ঠাবান মুসলমান হলে তার চারিত্রিক ও নৈতিক উন্নতি ঘটবে এবং সে ভাই বলে হিন্দুদের জড়িয়ে ধরবে ও কোলাকুলি করবে। ইসলাম সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ঐ সব মূর্খ হিন্দুর জানা নেই যে, সেই মুসলমানটি নিষ্ঠাবান মুসলমান হলে তাঁর নিজের কি ভয়ঙ্কর বিপদ উপস্থিত হবে। **কোন মুসলমান নিষ্ঠাবান হলে সে সঙ্গে সঙ্গে ঔরঙজেব বা তৈমুর লঙ বা বাবরের মতই একটি হিংস্র জানোয়ারে পরিণত হবে এবং উপদেশ প্রদানকারী সেই কাফেরের মাথাটি সবার আগে ধড় থেকে আলাদা করে ফেলবে। ক্ষমতা থাকলে সে সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়াকে কাফেরমুক্ত করবে। ইসলাম বর্হিভুত সমস্ত বই পুস্তক জ্বালিয়ে দেবে। ইসলাম বহির্ভূত সমস্ত উপাসনালয় ধ্বংস করবে এবং সমস্ত পৃথিবীতে আল্লার রাজত্ব কায়েম করবে।**

সেই সময় ঔরঙজেব কাশ্মীরের হিন্দুদের মুসলমান করার জন্য খুব অত্যাচার শুরু করে এবং শিখদের সপ্তম গুরু, গুরু তেগ বাহাদুর তার প্রতিবাদ করেন। **সেই কারণে ঔরঙজেব গুরু তেগ বাহাদুর ও তার তিন প্রিয় শিষ্যকে গ্রেফতার করে পশুর মত খাঁচায় বন্দি করে দিল্লী নিয়ে আসে। প্রথমে তিন শিষ্যকে ইসলাম গ্রহণ করতে বলা হয়। কিন্তু তারা অস্বীকার করার ফলে প্রথমে ভাই মতিদাস নামক শিষ্যকে করাত দিয়ে কাঠ চেরাই করার মত দুভাগ করে কাটা হয়। আর এক শিষ্য ভাই দিয়ালাকে একটা বড় হাড়িতে করে জীবন্ত সিদ্ধ করা হয় এবং তৃতীয় শিষ্যর গায়ে তুলো জড়িয়ে তা তেল দিয়ে ভিজিয়ে তাতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। তথাপি গুরু তেগ**

53.A. Ghosh, ibid, 48.

গুরু তেগবাহাদুরের শিরোচ্ছেদ
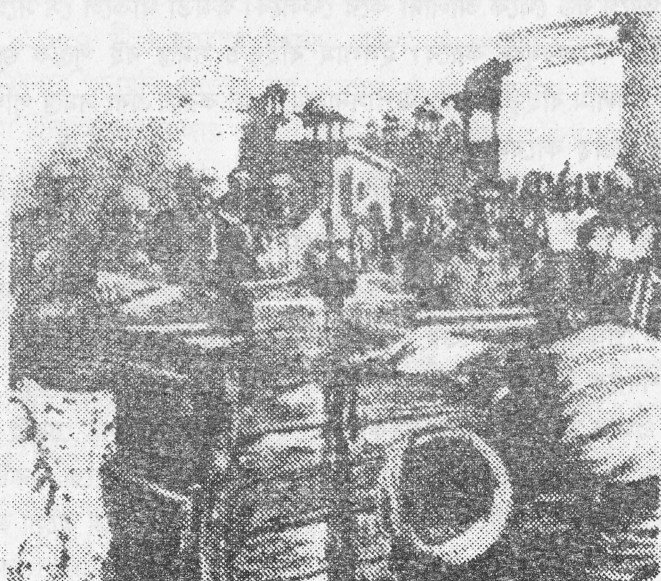
ভাই মোতিদাশকে করাৎ দিয়ে কাঠের মতো চেরাই করা হচ্ছে

আর এক শিষ্যকে গায়ে ন্যাকড়া জড়িয়ে তা তেল দিয়ে ভিজিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে
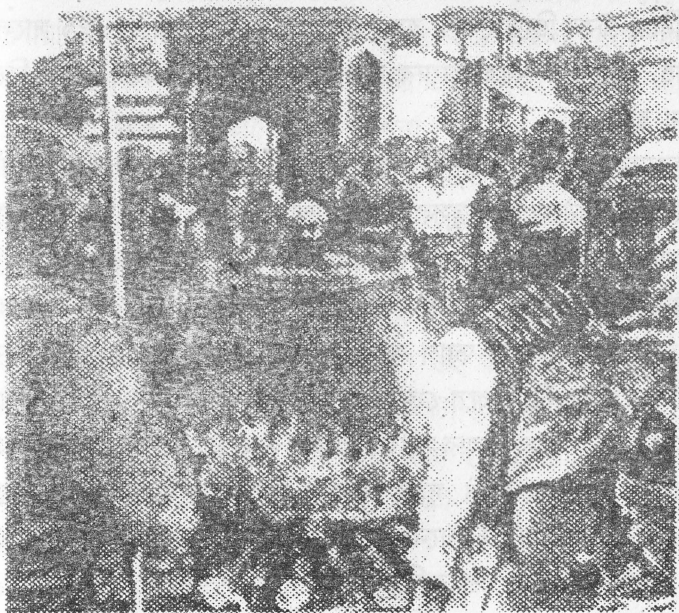
ভাই দিয়ালাকে জীবন্ত সিদ্ধ করা হচ্ছে

বাহাদুর ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করায় তাঁর মাথা তরোয়াল দিয়ে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। এর আগে আর এক মুসলমান জানোয়ার সম্রাট জাহাঙ্গীর শিখদের পঞ্চম গুরু অর্জুন সিংহকে তপ্ত লোহার ওপর বসিয়ে, তপ্ত বালি দিয়ে শরীর ঢেকে দিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে।[54]

১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ঔরঙজেব রাজা শিবাজীর পুত্র রাজা শম্ভাজী ও তাঁর মন্ত্রী কবি কলসকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়। পরাজিত শত্রুকে মুক্ত করে দেওয়া ইসলাম বিরুদ্ধ কাজ এবং ইসলামী নিয়ম হল যত বেশি সম্ভব যন্ত্রণা দিয়ে সেই শত্রুকে হত্যা করা। শত্রু যদি কাফের হয়, তা হলে তো কোন কথাই নেই। এক কোপে কাফেরের মাথাটা নামিয়ে দেওয়া কখনই চলতে পারে না, কারণ তাতে মৃত্যু যন্ত্রণা হবে ক্ষণস্থায়ী। তাই ইসলামী পন্থা হল, ধীরে ধীরে যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করা। এ ব্যাপারে প্রশস্ত রাস্তা হল ধীরে ধীরে শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কেটে কেটে সবার শেষে মাথা কেটে ফেলা। এই ইসলামী পদ্ধতি অনুসারে প্রথমে শম্ভাজীর চোখ দুটো উপড়ে ফেলা হয় এবং তাতে নুন এবং লেবুর রস দেওয়া হয়। অপর দিকে কবি কলসের জিভ শারাসী দিয়ে টেনে ছিড়ে ফেলা হয়। এর কয়েক দিন পর, ১৬৮৯ সালের ১১ই মার্চ, এক এক করে তাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কেটে কেটে কুকুর দিয়ে খাওয়ানো হয়।

কাফেরদের এই ভাবে ধীরে ধীরে যন্ত্রণা দিয়ে তিলে তিলে মারার ব্যাপরটা স্বয়ং নবী মহম্মদ নিজে করে মুসলমানদের শিখিয়ে দিয়ে গিয়েছেন। এক বার উকল গোত্রের ৮ জন লোক মদিনায় এসে ইসলাম গ্রহণ করে। কিন্তু তার কয়েক দিন পরেই তারা একটা উটের আস্তাবলের রক্ষীকে হত্যা করে উটগুলো নিয়ে পালায় এবং ইসলাম ত্যাগ করে। দু এক দিনের মধ্যেই মুসলমানরা সেই আটজন অপরাধীকে ধরে ফেলে ও মদিনায় নিয়ে আসে। নবী মহম্মদ তাদের দৃষ্টান্তমূলক সাজা দেবার সঙ্কল্প করলেন এবং তা নিজের হাতে দেবেন স্থির করলেন । প্রথমে তিনি দুটো লোহার শিক নিলেন এবং সেগুলোকে লাল করে গরম করে ওই ৮ জনের চোখে ঢুকিয়ে দিলেন। তারপর তাদের হাত পা কেটে মরুভূমির তপ্ত বালির ওপর চিৎ করে শুইয়ে রাখলেন। এ

54. P. N. Oak, ibid. 377.

ভাবে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তারা মারা গেল। এই ঘটনা থেকে বুঝতে সুবিধা হয় যে, স্বয়ং নবী কতখানি নিষ্ঠুর ও হিংস্র ছিলেন।[55]

আর একটি ঘটনা থেকেও নবীর হিংস্রতার পরিচয় পাওয়া যায়, তা হল ৮০০ কুরাইজা ইহুদীয় গণহত্যা। এ ব্যাপারে আরও একটা ঘটনার বর্ণনা করা চলতে পারে। ৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে শেষবারের মত হজ করতে যাবার সময় নবী কোরবানির জন্য ১০০ উট সঙ্গে নিয়ে যান। তাঁর ইচ্ছা ছিল সবগুলো উটকে তিনি নিজেই জবেহ্ করেন। **কিন্তু ৬৩টা উট জবেহ্ করার পর তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েন এবং জামাতা ও চাচাত ভাই আলি বাদবাকি উটগুলোকে জবেহ্ করে।**[56] আগেই বলা হয়েছে যে, নবী আতঙ্ক সৃষ্টি করে নজির ও কানুইকা গোত্রের ইহুদীদের মদিনা থেকে বিতাড়িত করেন। এর পর নজির ইহুদিরা উত্তর আরবের খয়বর নামক স্থানে বসবাস করতে থাকে। ৬২৮ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট বাসে নবী খয়বর অভিযান করেন। উদ্দেশ্য ছিল তাদের আরব ভূখন্ড থেকে উৎখাৎ করা। সেই সময় ইহুদী সর্দার কিনানা-র কাছ থেকে তার গুপ্তধনের হদিস বের করার জন্য **তার হাত পা বেঁধে চিৎ করে শোয়ানো হয় এবং বুকের ওপর জ্বলন্ত কাঠ কয়লা রেখে তাতে বাতাস দেওয়া হয়।**[57] **যাদের পথপ্রদর্শক নবী এমন হিংস্র ও নিষ্ঠুর তাঁর চ্যালারা হিংস্র ও নিষ্ঠুর হবে তাতে আর আশ্চর্য কি!**

অনেকের মনে হতে পারে যে, এককালে মধ্যযুগে মুসলমানরা এ সব হিংস্রতা ও নিষ্ঠুরতা করেছে বটে। তবে আজ দিন পাল্টেছে, তাই সেই সব হিংস্রতা তারা আজ আর করবে না। তাই এ ব্যাপারে কয়েকটি ঘটনা স্মরণ করা যেতে পারে। ১৯৪৬ সালে বাংলার প্রধান মন্ত্রী সুরাবর্দীর মেয়েকে হরেন ঘোষ নামক এক বৃদ্ধ গান শেখাতেন। ওই বছর ১৬ আগষ্ট মুসলমানরা হিন্দুদের আক্রমণ করে, যা গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং নামে খ্যাত। সুরাবর্দীর বাড়ীতেই ওই হিন্দু হত্যার ছক তৈরী করা হয়। পরে দেখা যায় যে, সেই ছকের কিছু কিছু অংশ হিন্দুরা আগেই থেকেই টের পেয়ে গিয়েছিল। স্বভাবতই সন্দেহ গিয়ে পড়ে হরেণ বাবুর ওপর।

---

55. muslim Sharif, 4130, 4131 and 4232.

56. Abdul Aziz al Aman, Kabar Pathe (in Volumes), I. 336.

57. R. Brahmachari, Islami Dharmatattava : Ebar Ghare Ferer Pala, 277-78.

তা ছাড়া সুরাবর্দী ও তার অনুচরের দল টালার জলের ট্যাঙ্ক, হাওড়া পুল, হাওড়া রেল স্টেশন, শিয়ালদহ রেল স্টেশন ইত্যাদি বোমা দিয়ে উড়িয়ে দেবার এক ব্যাপক পরিকল্পনা করে। সুরাবর্দীর অনুপস্থিতিতে একদিন সেই পরিকল্পনার খাতাটি হরেণবাবুর হাতে পড়ে। বিষয়টার গুরুত্ব উপলব্ধি করে হরেণবাবু তৎক্ষণাৎ সেই পরিকল্পনার বিষয় প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্তাদের গোচরে আনেন। ফলে কলকাতা এক ব্যাপক ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায়। এ ব্যাপারেও সুরাবর্দীর সন্দেহ গিয়ে পড়ে হরেনবাবুর ওপর। তাই সুরাবর্দীর লোকেরা তাকে ধরে নিয়ে আসে। **তারপর এক এক করে তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে তিলে তিলে যন্ত্রণা দিয়ে মারা হয়। পরে তাঁর টুকরো টুকরো করা মৃতদেহ একটা বাক্সে ভর্তি করে রাস্তায় ফেলে দেওয়া হয়।**[58] কার্গিল যুদ্ধের সময় ভারতীয় বিমান বাহিনীর একজন পাইলট নিখোঁজ হন। কিছু দিন পরে পাকিস্তানী মিলিটারী তার মৃতদেহ ভারতীয় সৈন্যদের হাতে তুলে দেয়। **বাক্স খুলে দেখা যায় তার দেহকে প্রায় ৫০ টুকরো করে কাটা হয়েছিল। বছর তিনেক আগে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষা বাহিনীর ১৮ জন জোয়ানকে বাংলাদেশ সীমান্ত রক্ষীরা ধরে নিয়ে যায়। সেই দেহগুলো যখন তারা ফেরৎ দেয় তখন দেখা যায় যে, তাদেরও টুকরো টুকরো করে কেটে যন্ত্রণা দিয়ে মারা হয়েছে।** এ ব্যাপারে কোরাণের নির্দেশ হল, **যে মুসলমান যত বেশি যন্ত্রণা দিয়ে কাফের হত্যা করবে,** সে **আল্লার কাছ থেকে ততবেশি** সোয়াব পুণ্য ও রহম রহমৎ (দয়া) পাবে।

যাই হোক, আরও কয়েকজন মুসলমান জানোয়ারের জিহাদের বীভৎসতা বর্ণনা করে এই প্রসঙ্গের ইতি করা সঙ্গত হবে। সকলেরই জানা আছে যে, ১৭৫৭ সালে বাংলার পলাশীর প্রান্তরে মুসলমান নবাব সিরাযদ্দৌলার সাথে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর যুদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু অনেকেরই হয়তো স্মরণ নেই যে, সেই বছরই আর এক মুসলমান জানোয়ার ভারতের মাটিতে ইসলামী জিহাদের বর্বরতার অনুষ্ঠান করেছিল। সেই দানবের নাম ছিল আহম্মদ শা আবদালি।

সেই দানব সর্বপ্রথম মথুরা ও বৃন্দাবন লুঠ করতে যায়। জওয়াহির সিং

58. A. Ghosh, ibid, 64.

নামে এক জাঠ বীর মাত্র ১০,০০০ লোক নিয়ে তাকে বাধা দেয়। ১৭৫৭ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হয় এবং ৯ ঘন্টা ধরে তুমুল যুদ্ধ চলে। তখন দেখা গেল দু পক্ষের ১০ থেকে ১২ হাজার সৈন্য মারা গিয়েছে এবং অসংখ্য আহত হয়েছে। এর পর মুসলমানদের বাধা দেবার কেউ থাকল না। আগের দিনের যুদ্ধে তাদের অনেক সৈন্য মারা গিয়েছিল সেই রাগে এবং আবদালির আদেশে ১লা মার্চ, ১৭৫৭ আফগান ঘোড়সওয়াররা দানবের মত মথুরা নগরীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। চার ঘন্টা ধরে চলল নির্বিচারে হত্যা, লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগ। সেই সঙ্গে মন্দির ও মন্দিরের বিগ্রহ ভাঙ্গার কাজও চলে অবাধে। গণহত্যা শেষ হলে আবদালি তার এক সেনাপতি নাজির খাঁকে সেখানে রেখে মথুরা ত্যাগ করল। সঙ্গে নিল প্রচুর পরিমানে লুণ্ঠিত মাল এবং বন্দী হিন্দু নারী ও শিশু। হিন্দুর রক্তে সেদিন যমুনার জল লাল হয়ে গিয়েছিল। দেখা গেল অনেক হিন্দু রমণী তাদের সম্মান ও সতীত্ব রক্ষা করতে কুয়ায় ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছে।[৫৯]

৬ই মার্চ আবদালির আদেশে সেনাপতি জাহান খাঁ মথুরার ৭ মাইল উত্তরে বৃন্দাবনে উপস্থিত হল। সেখানেও বর্বর মুসলমানের দল ঝাঁপিয়ে পড়ল অসামরিক নিরীহ হিন্দু বৈষ্ণবদের ওপর। সেই হত্যাকাণ্ড বর্ণনা করতে একজন মুসলমান লিপিকার লিখছে, "যে দিকেই তাকাই চোখে পড়ে কাটা মাথার স্তূপ, যার মধ্য দিয়ে কোন মতে সাবধানে পা ফেলে এগুতে লাগলাম, কারণ স্তূপীকৃত মৃতদেহ থেকে রক্ত চুঁইয়ে পড়ার ফলে পুরো বৃন্দাবনই পিছল হয়ে গিয়েছে। হঠাৎ এক জায়গায় দেখি প্রায় ২০০ শিশুর মৃতদেহ স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে আছে, কিন্তু কারও মাথা নেই। মৃত দেহের পচা গন্ধে পুরো বৃন্দাবন এত দুষিত হয়ে রয়েছে যে নিশ্বাস নেবার উপায় নেই, মুখ খুললে মনে হয় বমি হয়ে যাবে।"[59]

এর পর আবদালির বাহিনী উপস্থিত হল গোকুলে। কিন্তু সেখানে যুদ্ধ বিদ্যায় নিপুণ চার হাজার নাগা সন্যাসী তাদের বাঁধা দিল। গায়ে ভস্ম মাখা ৪ হাজার নগ্ন সন্যাসী প্রবল প্রতাপে যুদ্ধ করতে লাগল এবং প্রায় ২০০০ মুসলমানকে যমের দুয়ারে পাঠিয়ে দিল। ২০০০ সন্যাসীও মারা গেল।

59. J. N. Sarkar, Fall of the Mughal Empire, II, 69-70.

শহরের সমস্ত বৈরাগী কাটা পড়ল, কিন্তু প্রভু গোকুলনাথের মন্দির ও বিগ্রহ রক্ষা পেল।[60]

এইভাবে হিন্দুর রক্তে মাটি পিছল করতে করতে আবদালি আগ্রা পৌঁছল এবং আগ্রাও তার বর্বরতার শিকার হল। ফেরার পথে আবদালি শিখদের সর্বপ্রধান তীর্থস্থান অমৃতসরের স্বর্ণ মন্দির ধ্বংস করে। **১০০ গরু কেটে সেই গরুর রক্তে মন্দিরের পবিত্র জলাশয়কে অপবিত্র করে।**[60]

আজকাল আমাদের মার্কসবাদী ও সেকুলার ঐতিহাসিকরা টিপু সুলতানকে মহিমান্বিত করতে ব্যস্ত। কারণ মুসলমান তোষণকারী মেকি সেকুলার রাজনীতির কাছে ওই সব মেরুদণ্ডহীন ঐতিহাসিকরা নিজেদের বিক্রি করে দিয়েছে। তাই তাদের ইতিহাস লেখার উদ্দেশ্য হল, মুসলমানদের ভোট পাবার জন্য তাদের খুশী করা। তাই তাদের সিদ্ধান্ত হল, (১) ইসলাম শব্দের অর্থ বলতে হবে শান্তি। (২) ইসলাম যে একটি অমানবিক ও চূড়ান্ত এক ঘৃণার তত্ত্ব তা বলা যাবে না। বরং তাকে দেখাতে হবে উদার ও সহিষ্ণু এক মহান ধর্ম হিসাবে। এবং (৩) কোরাণকে দেখাতে হবে মহান সাম্যবাদী, জাতপাতের বিরোধী এবং বিশ্বভ্রাতৃত্বের ভাবে পরিপূর্ণ এক মহান গ্রন্থ হিসাবে। সেই একই নিয়মে **টিপু সুলতানকে দেখাতে হবে এক মহান ধর্মনিরপেক্ষ শাসক ও বৃটিশের সঙ্গে সংগ্রামকারী এক মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসাবে।**

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে টিপু সুলতান ছিল অন্যান্য মুসলমান শাসকের মতই কোরাণের জিহাদের তত্ত্ব দ্বারা উদ্বুদ্ধ এক দানব বিশেষ। মালাবার ও কুর্গ অঞ্চলের হিন্দুদের ওপর বীভৎস অত্যাচার চালিয়ে টিপু বলপূর্বক তাদের মুসলমান হতে বাধ্য করে। **আজকের কর্ণাটক ও কেরালার মুসলমানেরা প্রায় সকলেই সেই সময় টিপুর দ্বারা বলপূর্বক ধর্মান্তরিত হয়েছিল।** লণ্ডন স্থিত 'ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী"-তে ঐতিহাসিক কে এম পানিকর টিপুর লেখা কিছু চিঠিপত্র আবিষ্কার করেন যা থেকে টিপুর চরিত্র অনুমান করা চলে। ১৭৮৮ সালের ২২শে মার্চ টিপু তার সেনাপতি আব্দুল কাদের কে যে চিঠি লিখেছিল তার মর্মার্থ হল—"**১২,০০০- এর বেশি হিন্দুকে মুসলমান করা হয়েছে। তার মধ্যে অনেক নাম্বুদ্রি ব্রাহ্মণ আছে। এই সাফল্যের খবর হিন্দুদের**

---

60. J. D. Sen, Jihad in India, 51.

মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার করা দরকার। স্থানীয় হিন্দুদের মুসলমান করার জন্য তোমার কাছে তাদের ধরে নিয়ে এসো। একজন নাম্বুদ্রিও যেন বাদ না যায়।"[61]

১৭৮৮ সালের ১৪ই ডিসেম্বর তার এক উচ্চ কর্মকর্তাকে টিপু লিখছে, "আমি দুজন বিশ্বস্ত লোককে হুসেন আলির সঙ্গে পাঠাচ্ছি। এদের সাহায্যে সমস্ত হিন্দুদের ধরবে আর হত্যা করবে। যাদের বয়স ২০ বছরের কম তাদের জেলে ঢোকাবে এবং এই সংখ্যা ৫০০০ এর বেশি হলে বাকিদের গাছের সঙ্গে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেবে। এটা আমার আদেশ।"[61]

১৭৯০ সালে ১৯শে জানুয়ারী কর্মকর্তা বদ্রুস সামান খাঁকে টিপু লিখছে, "তুমি কি জান না যে সম্প্রতি মালাবারে আমি এক বিশাল সাফল্য অর্জন করেছি এবং ৪ লক্ষের ও বেশি হিন্দুকে ইসলামে ধর্মন্তরিত করেছি। আমি খুব শীঘ্রই অভিশপ্ত "রমণ নায়ার"-দের বিরুদ্ধে অগ্রসর হচ্ছি। এই সব প্রজাদের ইসলামে ধর্মান্তরিত করাটা সর্বাপেক্ষা জরুরী, তাই আমি বর্তমানে শ্রীরঙ্গপত্তম ফিরে যাবার পরিকল্পনা আনন্দের সঙ্গে স্থগিত রেখেছি।"[62]

আর একটি চিঠিতে টিপু তার সেনাপতিদের আদেশ দিয়ে লিখছে, "প্রত্যেক জেলার প্রত্যেক হিন্দুকে মুসলমান করতে হবে। গোপন জায়গা থেকে তাদের খুঁজে বের করতে হবে এবং সত্য, মিথ্যা, তরবারি ও ছলনার আশ্রয় নিয়ে তাদের সদলে ধর্মান্তরিত করে মুসলমান বানাতে হবে,"[62] ১৭৯৭ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী (৭ই সাবান, ১২১১ হিজরি)-তে আফগানিস্তানের শাসক আহম্মদ শা আবদালির সেনাপতি জামান শাহ কে লেখা একটি চিঠিতে টিপু আবদালিতে ভারত আক্রমণ করতে অনুরোধ জানিয়ে লিখছে, "আল্লার ইচ্ছা ও আল্লার রসুলের আদেশ অনুসারে আমাদের উচিত মিলিতভাবে ভারতের এই কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু করা।.....প্রত্যেক শুক্রবার আমার রাজ্যের মুসলমানরা জুমআর নামাজের পর খুৎবা দিচ্ছে (প্রার্থনা করছে), "হে আল্লা, আপনি ওই ঘৃণ্য কাফেরদের মস্তক ছিন্ন করে দিন। তাদের পাপের বোঝা তাদের মাথায় পতিত হোক। আমি বিশ্বাস করি সর্বশক্তিমান আল্লা আমাদের

61. J. D. Sen, ibid, 53.
62. J. D. Sen, ibid, 54.

প্রার্থনাকে কার্যকর করবেন এবং এই পবিত্র কাজে হাত মিলিয়ে অগ্রসর হলে আমরা নিশ্চয়ই সফল কাম হব।"(63)। এই ঘটনা থেকে এটাই প্রমাণ হয় যে, টিপু শুধু নিজের রাজ্য রক্ষা করার জন্যই বৃটিশের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল। ভারতবর্ষকে বৃটিশ পরাধীনতা থেকে মুক্ত করার কোন উদ্দেশ্য তার ছিল না। ভারতের স্বাধীনতা তার কাম্য হলে সে জামান শাহকে ভারত আক্রমণ করার আহ্বান করতে পারত না।

বহু খ্যাত "সোর্ড অফ টিপু সুলতান" নামক টিপুর একটি শিলালিপিতে ফার্সীভাষায় লেখা আছে, "**আমার জয় গৌরবের তরোয়াল এই দেশের কাফেরদের ধ্বংস করার জন্য বিদ্যুতের মত ঝলকাচ্ছে। হে আল্লা, আপনি আমাদের প্রভু, কাফেরদের নির্মূল করতে আপনি আমাদের সাহায্য করুন। হে আল্লা, আমরা যারা মহম্মদের সত্যধর্মকে প্রসারিত করতে চাই, তাদের আপনি জয়যুক্ত করুন। আর যারা মহম্মদের সত্যধর্মের বিরোধিতা করে তাদের পরাজিত ও বিহ্বল করুন। তাদের বিরুদ্ধে বিশাল বিজয় হাসিল করতে, হে আল্লা, আপনি আমাদের সাহায্য করুন।**"(64)। টিপুর লেখা এরকম আরও অনেক শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে, এবং ওই সব সমস্ত শিলালিপিতেই আল্লার কাছে কাফেরদের সমূলে ধ্বংস ও মুসলমানদের মহান বিজয় প্রার্থনা করা হয়েছে।

লণ্ডন স্থিত ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে টিপুর লেখা দুখানা আত্মজীবনী সুলতান-ই-তাওয়ারিখ ও তারিখ-ই-খুদাদাদি রক্ষিত আছে। **হিন্দুদের ওপর টিপু নামক ধর্মান্ধ জানোয়ার যে অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছিল এবং অত্যাচারের দ্বারা কিভাবে বলপূর্বক তাদের মুসলমান করেছিল, তার বিস্তৃত বিবরণ ওই দুইখানি আত্মজীবনী গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে।** টিপুর সেকুলার জীবনীকার হিস্টোরি অফ টিপুসুলতান গ্রন্থের লেখক জনাব মহিকুল হাসানও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, "ওই দুই গ্রন্থে প্রাপ্ত তথ্যাদি থেকে এটাই প্রমাণ হয় যে, **ধর্মের ব্যাপারে টিপু ছিল একটি বদ্ধ উন্মাদ। তার একটাই কাজ ছিল, তা হল হিন্দুদের অকথ্য অত্যাচার করা এবং অত্যাচার করে তাদের**

---

63. J. D. Sen, ibid, 55.
64. C. H. Rao, History of Mysore, III, 1073.

মুসলমান করা।"(65) এ প্রসঙ্গে বলে রাখা সঙ্গত হবে যে, টিপুর প্রিয় খেলা ছিল **হিন্দু কাফেরদের হাত পা হাতির সঙ্গে বেঁধে হাতিগুলোকে ছুটিয়ে দেওয়া এবং এভাবে কাফেরের দেহকে ছিন্নভিন্ন করা।**(65)

যে সব সেকুলার ঐতিহাসিকরা টিপুকে ধর্মনিরপেক্ষ সাজাতে চেষ্টা করছেন তাদের হয়তো জানা নেই যে টিপু দক্ষিণ ভারতে ৮০০ (কারও মতে আরও বেশি) মন্দির ধ্বংস করেছিল। দক্ষিণের এক রাজা, নাম চিরাক্কাল, টিপুকে মন্দির ভাঙতে নিষেধ করে বলেছিলেন যে, বদলে তিনি তাকে ৪ লক্ষ টাকা দেবেন। জবাবে টিপু তাকে জানাল "**এমনকি পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ যদি কেউ আমাকে এনে দেয় তবুও তা আমাকে হিন্দুর মন্দির ভাঙা থেকে নিরস্ত করতে পারবে না।"**(66)

তেমনি অনেক বাঙালী সেকুলার মার্কা ঐতিহাসিকরা সিরাজ উদ্দৌলাকে ধর্মের ব্যাপারে উদার একজন দেশপ্রেমিক শাসক হিসাবে তুলে ধরার চেষ্টা করে চলেছেন। তাদের মতে সিরাজ বাংলার স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য বৃটিশের সঙ্গে যুদ্ধ করে প্রাণ দিয়েছেন। কিন্তু প্রকৃত সত্য হল, দাদু আলিবর্দীর আদরে সিরাজ কিশোর বয়সেই একজন সুশ্চরিত্র লম্পটে পরিণত হয়। সিরাজ ও তার চ্যালাদের অত্যাচারে হিন্দু রমণীদের পক্ষে গঙ্গায় স্নান করতে যাবার উপায় ছিল না। সিরাজ ও তার চ্যালারা কত হিন্দু কুমারী ও গৃহবধূর যে সর্বনাশ করেছে তার গুণে শেষ করার উপায় নেই। মাত্র ২০ বছর বয়সেই লম্পট সিরাজ হিন্দুদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। এবং সেই লম্পট নবাব হলে যে কত দুষ্কর্ম করতে পারে তা বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।

পলাশীর যুদ্ধে হেরে পালাবার সময় বৃটিশরা তাকে ধরে ফেলে এবং মুর্শিদাবাদে নিয়ে আসে। **তারপর তার শরীর টুকরো টুকরো করে কেটে তা হাতির পিঠে চাপিয়ে সারা মুর্শিদাবাদ শহরে ঘোরানো হয়। তারপর তা কুকুর দিয়ে খাওয়ানো হয়।** এইভাবে সেই লম্পটের ১৫ মাসের রাজত্ব শেষ হয়। এবং হিন্দুরা সেই জানোয়ারের হাত থেকে মুক্তি পায়।(67)

---

65. J. D. Sen, ibid, 56.

66. Sarkar K. M. Panickar, Freedom Movement in Kerala (as quoted by J. D. Sen, ibid, 57).

67. A. Ghosh, ibid, 49.

আল্লা বনাম সর্বশক্তিমান ঈশ্বর

হিন্দু গান রচনা করেছে "ঈশ্বর আল্লা তেরে নাম", অর্থাৎ যিনি ঈশ্বর তিনিই আল্লা। কিন্তু যে হিন্দু এই গান রচনা করেছেন তাঁর জানা নেই যে, ঈশ্বর হতে গেলে যে যোগ্যতা দরকার, আল্লার তা নেই। আল্লা যদি ঈশ্বর হত, তবে সব মানুষই তার কাছে সমান হত। যেমন হিন্দুর ভগবান গীতায় বলেন,

সমোহহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোহস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্।। (৯/২৯)

--অর্থাৎ, সবাই আমার কাছে সমান, কেউ আমার প্রিয়ও নয়, কেউ আমার বিদ্বেষভাজনও নয়। কিন্তু আল্লার দৃষ্টিতে সব মানুষ সমান নয়। শুধু মুসলমানদের প্রতিই আল্লা বা রহমানির রহিম বা পরম দয়ালু দয়াময়। কিন্তু হিন্দু সহ সমস্ত অমুসলমানদের প্রতি তিনি নির্মম নৃশংস একজন ঘাতক বা জল্লাদ বিশেষ। কাজেই এরকম পক্ষপাত দোষে দুষ্ট আল্লা এই জগতের ঈশ্বর হতে পারেন না।

এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী তাঁর "সত্যার্থ প্রকাশ" গ্রন্থে লিখছেন, "If the God of Quran had been the protector of all creatures and the dispenser of forgiveness and mercy to all, He would not have commanded the Muslims to kill the people of other religions", অর্থাৎ, "কোরাণের ভগবান (অর্থাৎ আল্লা) যদি সমস্ত জীবগণের সৃষ্টিকর্তা এবং তাদের সকলের প্রতি ক্ষমাশীল ও দয়াময় হতেন তবে তিনি মুসলমানদের হুকুম দিতে পারতেন না যে অন্য ধর্মে বিশ্বাসী সব মানুষকে হত্যা কর।" তিনি আরও লিখছেন যে এই কারণে "মনে হয় না যে কোরাণ ভগবানের দ্বারা রচিত"।[68]

এই বিষয়ে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর Practical Vedanta গ্রন্থে লিখছেন, "God who is partial to His children called men and cruel to His children called brute beasts (Kafirs) is worse than a demon. I

---

68. Swami Dayananda Saraswati, Satyartha Prakash, Ch. XIV.

would rather die a hundred times than worship such a God. My whole life would be a fight with such a God" --অর্থাৎ, "যেই ভগবান এক ধরণের মানুষের প্রতি পক্ষপাত দোষে দুষ্ট এবং অন্য ধরণের মানুষকে বলেন পশুর সমান (কাফের), তিনি একজন দানবের থেকেও অধম। আমি এক শতবার জন্ম নিয়ে এই পৃথিবীতে আসতে (অর্থাৎ জাগতিক দুঃখ ভোগ করতে) রাজি আছি, কিন্তু ওই রকম ভগবানকে পূজা করতে রাজি নই। আমি বরং সেই ভগবানের সঙ্গে সারাজীবন সংগ্রাম করে যাব।" কাজেই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, আল্লা মুসলমান নামক এক প্রকার মানবেতর প্রাণীরই ভগবান, সমগ্র মানবজাতির ভগবান তিনি নন্।

এ ব্যাপারে আরবী শব্দ "আল্লা"-র ব্যুৎপত্তিগত অর্থ সম্বন্ধে দু চার কথা বলা সঙ্গত হবে। দুটি আরবী শব্দ "আল" ও "ইলাহ" মিলে "আল্লাহ্" শব্দের উৎপত্তি। আরবী আল্-এর ইংরাজী হল The এবং বাংলায় টি বা টা। এবং ইলাহ্ বলতে বোঝায় উপাস্য। কাজেই আল্লাহ্ শব্দের অর্থ দাঁড়ায় উপাস্যটি বা উপাস্যটা যার মধ্যে জগৎ সংসারের নিয়ন্তা পরমেশ্বরের ভাব অনুপস্থিত। সুতরাং আল্লা বলতে আরবের কোন এক উপাস্য বোঝায়, বিশ্ব নিখিলের নিয়ন্তা জগদীশ্বর বোঝায় না।

অনেকের ধারণা হতে পারে যে, মুসলমানরা যেহেতু আল্লার মূর্তি তৈরি করে না, বা মূর্তি তৈরি করে পূজা করে না, তাই তাদের আল্লা নিরাকার। কিন্তু এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। কোরাণের আল্লা সাকার এবং তার উচ্চতা ৬০ হাত এবং তিনি দেখতে মনুষ্যাকৃতি (মুসলীম হাদিস-৬৮০৯)। আল্লার আকৃতি যে মানুষের মত তার প্রমাণ হল, তিনি তাঁর নিজের আদলে প্রথম মানব হজরৎ আদম (সংস্কৃত আদিম থেকে উৎপন্ন) কে সৃষ্টি করেছেন (মুসলীম হাদিস-২৮৭২)। আল্লার চেহারা যে মানুষের মত তা আরও স্পষ্ট হয় যখন আল্লা বলেন -- "দুজন মুসলমান মারামারি করলে কারও পক্ষে অপর জনের মুখমণ্ডলকে বিকৃত করা উচিত নয়, কারণ আল্লা মানুষের মুখমণ্ডল নিজের মুখমণ্ডলের মত করে গড়েছেন (মুসলীম হাদিস - ৬৩২৫)। আল্লা নিরাকার নন তার কারণ হল, সভ্যতায় অনগ্রসর, পশুপালক আরবদের মধ্যে নিরাকার ঈশ্বর কল্পনা করার মেধার অভাব। আজকের মুসলমানদের মধ্যেও নিরাকার,

ঈশ্বর কল্পনা করার মত মেধা আছে কিনা তা সন্দেহের বিষয়।

আল্লা নিজের আদলে আদমকে সৃষ্টি করেছেন, এই ঘটনা থেকে এটাও প্রমাণ হয় যে, **আল্লা পুরুষ মানুষ।** আল্লা যে পুরুষ তা আরও পরিষ্কার হয় **যখন আল্লা কোরাণ মারফৎ খবর দেন যে, তাঁর কোন স্ত্রী নেই** (কোরাণ-৬/১০১)। আল্লা শুধু পুরুষ মানুষই নয়, **তিনি সক্ষম পুরুষ এবং কোন মানবীতে গমন করে তিনি পুত্র উৎপাদন করার ক্ষমতা রাখেন।** মহম্মদের জীবিতকালে ইহুদী ও খ্রীস্টানদের মধ্যে এই বিতর্ক দেখা দেয় যে, ঈশা যেহেতু কুমারী মরিয়মের গর্ভে জন্মেছিলেন, তাই তাঁর পিতা কে? এরকম এক বিতর্ক সভায় মহানবী উপস্থিত ছিলেন এবং সেখানে খ্রীস্টানরা বলতে থাকল যে, আল্লাই ঈশার পিতা। এর জবাবে ইহুদীরা বলল যে, আল্লা কি তবে মরিয়মে গমন করেছিল? আল্লা মরিয়মে গমন করে পুত্র ঈশাকে উৎপাদন করেছিলেন, এ একটা ব্যাখ্যা হয় বটে, কিন্তু নবীর পক্ষে তা মেনে নেওয়া সম্ভব হয় না। কারণ তা হলে আল্লার সম্মানহানি হয় এবং তিনি পরস্ত্রীতে গমনকারী ব্যভিচারী প্রমাণিত হন। যাই হোক নবী তাঁর তীক্ষ্ম বুদ্ধি ও অসীম প্রজ্ঞার সাহায্যে শেষ পর্যন্ত এই বিতর্কের মীমাংসা করলেন। বললেন, আল্লা যেমন তাঁর বিশেষ কুদরতের সাহায্যে মাটি দিয়ে হজরৎ আদমকে সৃষ্টি করেছিলেন, ঠিক সেই রকম কুদরতের সাহায্যে তিনি মরিয়মের গর্ভে হজরৎ ঈশাকে সৃষ্টি করেছিলেন।[69] ভাবতে অবাক লাগে যে আরবের মত মূর্খের দেশে জন্মগ্রহণ করেও নবী মহম্মদ এত প্রখর মেধা ও প্রজ্ঞার মালিক হয়েছিলেন কি করে।

এ সব তর্ক বিতর্কের মধ্যে আরও একটা লক্ষ্য করার বিষয় হল, ইহুদী ও খ্রীস্টানদের শাস্ত্র মতেও আল্লা একজন সক্ষম পুরুষ। কিন্তু যেহেতু তাঁর কোন স্ত্রী নেই এবং অন্য কোন রমণীতেও তিনি গমন করেন না, তাই তাঁর পুরুষত্বের কোন ব্যবহার নেই। তাই মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, সুদীর্ঘ হাজার হাজার বছর অব্যবহারের ফলে আল্লার পুরুষত্বের কতখানি আজ অবশিষ্ট আছে, না কি তা সম্পূর্ণরূপে লোপ পেয়েছে?

আল্লার আর একটি বিশেষ ক্ষমতা হল, মনে মনে কিছু স্থির করে তিনি

---

69. Abdul Aziz al Aman, Kabar Pathe, II, 190.

যেই "কুন্" (অর্থাৎ "হও") বলেন, তখনই তা হয়ে যায় এবং এই সৃষ্টি কাজের জন্য কোন কাঁচামালের দরকার হয় না। এই তত্ত্ব বর্তমান বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। অথচ ভারতীয় মতানুসারেও শূন্য থেকে সৃষ্টি সম্ভব নয়। বেদান্ত মতে অজ, নিত্য, শাশ্বত ও সর্বব্যাপী চৈতন্যময় সত্তা ব্রহ্মই হল এই সৃষ্টির মূল উপাদান। সর্গ বা সৃষ্টিকালে এই ইন্দ্রিয়াতীত ব্রহ্ম থেকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশ্বজগতের উৎপত্তি হয় এবং প্রতিসর্গ বা প্রলয়কালে তা আবার ইন্দ্রিয়াতীত ব্রহ্মে লীন হয়ে যায়। এ ব্যাপারে সাংখ্য দর্শনের প্রণেতা ঋষি কপিল বলছেন, "নাবস্তুনো বস্তু সিদ্ধিঃ"---অর্থাৎ অবস্তু থেকে বস্তুর উৎপত্তি সম্ভব নয়।

যাই হোক, কোরাণের আল্লা অসম্ভব ক্রোধী, ঈর্ষাপরায়ণ এবং অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও নৃশংস। আল্লা ছাড়া অন্য কারও ভজনা করলে আল্লার খুব রাগ ও হিংসা হয়। সেই সমস্ত লোকদের তিনি সম্ভব হলে ইহলোকেই তাঁর রোষানলে শেষ করেন অথবা পরলোকে নরকের আগুনে দগ্ধ করেন। অর্থাৎ আল্লা অতিশয় তমোগুণাশ্রিত। উপরন্তু তাঁর বান্দারাও যদি ওই সব লোকদের উপর অত্যাচার চালায় বা হত্যা করে তাহলে আল্লা খুশী হন এবং সেইসব খুনী বান্দাদের তিনি ইহলোকে লুটের মাল এবং পরলোকে জান্নাত নামক তাঁর পতিতালয়ে আশ্রয় দেন। এর কোনটাকেই ঈশ্বরীয় কাজ বলা যায় না। বরং তাঁকে একটি মাফিয়া দলের দলপতি বলে মনে হওয়াই স্বাভাবিক।

ভারতীয় দর্শন মতে গুণ থেকে বস্তু আলাদা করা যায় না। যেমন আগুন থেকে তার দাহিকা শক্তি, বরফ থেকে তার শৈত্য এবং জল থেকে তার সিক্ত করার গুণকে আলাদা করা যায় না। অর্থাৎ গুণ থাকলে তার আধারও থাকবে। সুতরাং ভারতীয় দর্শন মতে উপরিউক্ত প্রাকৃতিক গুণ সম্পন্ন আল্লা নিরাকার হতে পারে না। অর্থাৎ আল্লার দেহ আছে। দেহ থাকলে তার ক্ষয় আছে। কাজেই কোরাণের প্রাকৃতিক গুণ সম্পন্ন আল্লার ক্ষয় এবং ধ্বংস অনিবার্য।

বেশীরভাগ মুসলমানই মনে করেন যে, এই পৃথিবীতে একমাত্র তাঁরাই নিষ্ঠাবান একেশ্বরবাদী। কিন্তু "হরফ প্রকাশনী" দ্বারা প্রকাশিত "ঋগ্বেদ সংহিতা"

গ্রন্থের ভূমিকায় শ্রীআবদুল আজিজ আল আমান সাহেব লিখছেন, "**বেদের ঈশ্বর সম্পর্কীয় চিন্তাভাবনাগুলি গভীর মনোনিবেশ সহকারো পাঠ করলে বোঝা যায়, বেদের ঋষিগণ একেশ্বর চিন্তাভাবনায় অধিকতর উৎসাহী ছিলেন।**" তিনি আরও লিখছেন, "**একেশ্বর চিন্তা উপনিষদে আরও ব্যাপক ও গভীর। ... সুতরাং বলা যেতে পারে যে, কোরাণ শরীফ অবতীর্ণ হবার অনেক পূর্বেই একেশ্বর চিন্তা ভারতভূমিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন।**"[70] কাজেই হিন্দুর বহু দেবদেবী আরাধনার মূলে **বৈদিক সত্য "একং সদ্বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি"** যে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত, তা আল আমান সাহেবের দৃষ্টি এড়ায়নি।

---

70. Abdul Aziz al Aman, Preface of the Koran, translated by G. C. Sen.

নামাজ হল নিয়মিত সামরিক অভ্যাস

অনেক হিন্দু আবার এই মনোভাব পোষণ করেন যে, মুসলমানরা কত ধর্মপ্রাণ, তারা দিনে ৫ বার নামাজের মধ্য দিয়ে তাদের ভগবান আল্লাকে ডাকছে। এ ব্যাপারে প্রথমই বলে নেওয়া ভাল যে, ইসলামে চরম আধ্যাত্মিক প্রাপ্তি হল জান্নাত বা আল্লার পতিতালয়ে যাওয়া। কিন্তু আগেই বলা হয়েছে যে, শুধু মাত্র "লা ইলাহা ইল্লাল্লা, মহম্মদুর রসুলুল্লা" কলেমা গ্রহণ করার জন্য কেয়ামতের দিন আল্লা সব মুসলমানের পাহাড় প্রমাণ পাপ ক্ষমা করবেন এবং সব রকমের দুষ্কর্মকারী, পাপাসক্ত এবং অত্যন্ত অধঃপতিত মুসলমানকেও তাঁর জান্নাতে দাখিল করবেন। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, জান্নাতে যাবার জন্য নামাজ বা রোজা, কিছুরই দরকার নেই। তাই প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, কেন তবে মুসলমানরা মসজিদে গিয়ে দিনে ৫বার নামাজ পড়ে এবং পুরো একমাস ধরে রোজা রাখে।

হিন্দু বলে ভগবানকে ডাকতে হয় মনে, বনে, কোণে, বা একা, নির্জনে গিয়ে। কিন্তু ইসলামী শাস্ত্র মতে কোন মুসলমান নির্জনে গিয়ে একা একা নামাজ পড়লে খুবই সামান্য পুণ্য হবে। সে যদি মহল্লার মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়ে তাহলে তার দশগুণ পূণ্য (সোয়াব) হবে এবং সে যদি কোন জাম-এ-মসজিদে গিয়ে সেই নামাজ পড়ে তাহলে ১০০ গুণ সোয়াব হবে। এভাবে বাড়তে বাড়তে মক্কার মসজিদুল হারামে গিয়ে সেই নামাজ পড়ে তাহলে ১ লক্ষ গুণ পুণ্য হবে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, যত বেশি সংখ্যক লোক এক সঙ্গে নামাজ আদায় করবে, পুণ্যের মাত্রাও তত বাড়তে থাকবে। কাজেই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, **নামাজের মূল লক্ষ্য আল্লাকে ডাকা নয়, আল্লার নাম করে লোক জড়ো করা।** এই কারণে নবীর সময় কেউ একা একা ঘরে নামাজ পড়লে নবী তার ঘরে আগুন দেবার কথা বলতেন।

এরপর আছে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো। ইমামের কথা মত একবার ওঠা, একবার বসা। একবার কোমর বাঁকিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়া, বসে মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে প্রণাম করা, উঠে দাঁড়ানো ইত্যাদি। এই সব দেখলে বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় যে, **নামাজের প্রথম উদ্দেশ্য হল মুসলমানদের**

মসজিদে একত্রিত করা। মুসলমানদের নিজেদের মধ্যে আলাপ সালাপ, কথা বার্তা, ইত্যাদির মধ্য দিয়ে সঙ্ঘবদ্ধতা (regimentation) বাড়িয়ে তোলা এবং দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হল সামরিক প্রশিক্ষণ। এই কারণেই মহম্মদের জীবিতকালে মুসলমানরা যত যুদ্ধ করেছে, সব ক্ষেত্রে নামাজ পড়ে সেই যুদ্ধ শুরু করেছে। ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগষ্ট কলকাতায় মুসলমানরা যে দাঙ্গা শুরু করেছিল, নামাজ পড়েই তা শুরু করেছিল। **সেদিন ছিল পবিত্র জুমআ বা শুক্রবার এবং দুপুরে জুমআর নামাজ শেষ করেই তারা দাঙ্গা (বা জিহাদ) শুরু করেছিল।**

এ ব্যাপারে নামাজের আগে যে আজান দেওয়া হয় তারও কিছুটা ভূমিকা আছে। আজানের সময় যা বলা হয় তা হল—

(১) "**আল্লাহু আকবর**" (৪বার), অর্থ আল্লাই সর্বশ্রেষ্ঠ।

(২) "**আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লা**" (২বার), অর্থ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লার ব্যতীত উপাস্য নেই।

(৩) "**আশহাদু আল্লা মহম্মদুর রসুলুল্লা**" (২বার), অর্থ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মহম্মদ আল্লার রসুল।

(৪) "**হাইয়া আলাস্‌সালাহ্‌**" (২ বার) অর্থ, নামাজের জন্য এসো।

(৫) "**হাইয়া আলালফালা**" (২ বার) অর্থ, মঙ্গলের জন্য এসো।

(৬) "**আল্লাহু আকবর**" (২ বার)

(৭) "**লা ইলাহা ইল্লাল্লা**" (১বার) অর্থ, আল্লাই একমাত্র উপাস্য।

আজানের মুখ্য ভূমিকা হল, নামাজের জন্য মসজিদে লোক যোগার করা। কারণ নামাজের আজান কানে গেলে সেই মসজিদে গিয়ে নামাজে যোগ দেওয়া মুসলমানদের পক্ষে বাধ্যতামূলক। আজকাল লাউডস্পীকারের মাধ্যমে আজান দেওয়ার ফলে অনেক দূর পর্যন্ত সে আওয়াজ পৌঁছে যায়। ফলে সেই দূরের মুসলমানদের পক্ষেও নামাজে যোগ দেওয়া বাধ্যতামূলক হয়ে পড়ে।

মহম্মদের জীবিতকালে মুসলমানরা কোন কাফের বসতি আক্রমণ করার সময় ভোরে ফজরের নামাজের পরেই তা শুরু করত। এই সময় আজানের আর একটি উপকারিতা কাজে আসত। যদি সেই ভোরের সময় সেই বসতি

থেকে আজানের শব্দ ভেসে আসত, তবে মুসলমানরা বুঝতে পারত যে, সেখানে সবাই কাফের নয়, মুসলমানও আছে। কাজেই আক্রমণও সেই রকম হত। এই সব আলাচনা থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, **আল্লার জান্নাতে যাবার জন্য নামাজের প্রয়োজন না থাকলেও জিহাদের জন্য নামাজের প্রয়োজন আছে।** প্রত্যেক মুসলমানের জন্য দিনে ৫বার নামাজ ফরজ (অবশ্য কর্তব্য) এবং এগুলো হল, (১) **ফজর** (উষাকালের), (২) **যোহর** (দুপুর বেলার), (৩) **আসর** (অপরাহ্নের), (৪) **মাগ্রিব** (সন্ধ্যাকালের) এবং (৫) **এশা** (রাত্রির)।

নামাজের সময় নামাজিরা মসজিদে জড়ো হবার পর নিখুঁতভাবে সারি দিয়ে দাঁড়ালে ইমাম নামাজ পরিচালনা করেন। এই সময় নামাজিদের কোরাণের প্রথম সুরা, সুরা ফাতিহা মুখস্ত বলতে হয় এবং কোরাণের আরও তিনটি আয়াৎ মুখস্থ বলতে হয়। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হল, **ইমামরা কোরাণের কাফের হত্যার ভয়ঙ্কর জিহাদের আয়াৎগুলি থেকে ওই তিনটি আয়াৎ ঘুরে ফিরে আবৃত্তি করেন।** তাই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, দিনে পাঁচ বার করে ওই নিষ্ঠুর ও হিংস্র জিহাদের আয়াতগুলি আবৃত্তি করলে একজন মানুষের মন কতখানি বিষাক্ত হয়ে উঠতে পারে এবং কাফেরদের প্রতি কি পরিমাণ ঘৃণা সেই নামাজির মনে তৈরি হতে পারে।

তারপর নামাজ শেষ হবার পর থাকে ইমামের খুৎবা বা ধর্মীয় বক্তৃতা। এই খুৎবা শোনাও সব নামাজির পক্ষে বাধ্যতামূলক। অনেকের মনে হতে পারে যে, যেহেতু একটা ধর্মীয় উপাসনালয়ের একজন ধর্মীয় ব্যক্তি ইমাম এই খুৎবা দিচ্ছেন, তাই তা প্রেম, মৈত্রী ও ভ্রাতৃভাবে পরিপূর্ণ হতে বাধ্য। তাই ইসলামের সর্বাপেক্ষা পবিত্র ও খুশীর ঈদের দিন নামাজের পরে ইমাম যে খুৎবা দিয়ে থাকেন তার অংশ বিশেষ নীচে দেওয়া হল—"**হে আল্লা, (আপনি) ইসলাম ধর্ম ও মুসলমানদের চিরকাল জয়যুক্ত করুন, আর অবাধ্য কাফের ও বেদাআতি মোশরেকদের সর্বদা পদানত ও পরাস্ত করুন। হে আল্লা, যে বান্দা আপনার আজ্ঞাবহ হবে, তার রাজ্য চির অক্ষয় রাখুন। তিনি রাজার পুত্র রাজা হোন, কিংবা খাকান পুত্র খাকান হোন, স্থল বা নদীভাগের অধিকর্তা হোন, কিংবা দুই সাগরের মালিক হোন, তিনি পবিত্র মক্কা ও মদিনার সেবক**

হোন, কিংবা আল্লার পথে জেহাদ ও সংগ্রামকারী হোন, তিনি যদি মুসলমান রাজা হ'ন, আল্লা তার রাজ্য ও অধিকৃত সাম্রাজ্যকে চির অক্ষয় রাখুন।..... তবেই তরবারি দ্বারা বিদ্রোহী মহাপাতকী ও অবাধ্যদের (অর্থাৎ কাফেরদের) মস্তকচ্ছেদন করে নিশ্চিহ্ন করে দিন।...হে আল্লা, আপনি ধ্বংস করুন কাফেরদের, বেদাআতি মোশরেকদের। হে আল্লা, তাদের দল ও সঙ্ঘকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দিন। হে আল্লা, তাদের দেশসমূহকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিন''।[71]

আমাদের দেশের অনেক রাজনৈতিক নেতা রমজান মাসের রোজার সময় মুসলমানদের ইফতারের নিমন্ত্রণ করেন এবং ঈদের দিন নামাজের পরে তাদের সঙ্গে কোলাকুলি করতে যান। উপরের এই খুৎবা পড়ার পর তাদের সেই উৎসাহে যে কিছুটা ভাঁটা পড়বে তা বলাই বাহুল্য।

কোন শিশুর বয়স ৭ বছর হলেই তাকে মসজিদে নিয়ে যেতে হবে এবং নামাজ শিক্ষা দিতে হবে। যদি বয়স ১৭ বছর হওয়া সত্ত্বেও কোন বালক ঠিক মতন নামাজ আদায় না করে তবে তাকে লাঠি দিয়ে পেটাতে হবে, খাওয়া বন্ধ করে একলা ঘরে শুতে দিতে হবে। কাজেই বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় যে, কোন শিশুকে ৭ বছর বয়স থেকে দিনে ৫ বার করে কোরাণের কাফের নিধনের বাণী শোনালে এবং দুনিয়ার সমস্ত কাফের হত্যা করে সমগ্র পৃথিবীকে দার-উল-ইসলাম বানাবার অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ও সাম্প্রদায়িক খুৎবা শোনালে সেই শিশুর মন কতখানি কলুষিত ও সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন হতে পারে তার মনে কাফেরদের প্রতি কতখানি ঘৃণার উৎপত্তি হতে পারে এবং কাফেরদের প্রতি সে কতখানি হিংসাত্মক হয়ে উঠতে পারে। মনোবিজ্ঞানিদের মতে এই সব নির্দেশ রোজ শুনলে মানুষ তার নিজস্ব বিচারবুদ্ধি হারিয়ে ফেলে এবং কাফের হত্যা তখন মশা মারার মতন সহজ হয়ে যায়। এবং সেই রক্তপাত তার মনে কোন বিকার সৃষ্টি করে না।

এরপরে রয়েছে ইদুজ্জোহা বা বকরীদের দিন পশু কোরবানি। নামাজ হল **কাফের হত্যার মনস্তাত্ত্বিক প্রস্তুতি এবং কোরবানির ঈদের দিন চাকু দিয়ে পুঁচিয়ে পশু কাটা হল কাফেরের গলা কাটার হাতে কলমে ট্রেনিং।** আরবী বছরের শেষ মাস হল জিলহজ এবং এই জিলহজ মাসের ১০ তারিখে এই

71. মুসলীম পঞ্জিকা, ১৪০০ বঙ্গাব্দ, হরফ প্রকাশনী, ১৬৯।

পশু কোরবানীর ঈদ পালিত হয়। এই জিলহজ মাসেই মুসলমানরা মক্কায় হজ করতে যায়। যারা হজ করতে যায় তারা সকলেই ওই দিন মক্কার কাছে মীনাতে পশু কোরবানী করে। আরবে গরু নেই, তাই তারা লক্ষ লক্ষ ছাগল, ভেড়া, দুম্বা, উট ইত্যাদিই কোরবানী করে। তাছাড়া ইসলামী শাস্ত্রের কোথাও লেখা নেই যে গরু কোরবানী করতে হবে। কিন্তু **আমাদের দেশের মুসলমানরা হিন্দুর ধর্ম-ভাবনাকে আঘাত করার জন্য বেশি বেশি করে গরু কোরবানী করে থাকে।**

এখানে আরও একটা বিষয় লক্ষ্য করার আছে। যেই আরবে ইসলামের অভ্যুদয় হয়েছিল সেই আরবের জমি মরু সদৃশ। তাই সেখানে চাষবাস হয় না। পশুপালন হল সেখানে প্রধান জীবিকা। লোকেরা ভেড়া, দুম্বা, উট ইত্যাদি পালন করে এবং তাদের দুধ ও মাংস খায়। তাদের সাধারণ মানুষের খাদ্য হল খেজুর ও মাংস। তাই সেখানকার সকলেই কসাই এবং সেই পশুপালক সংস্কৃতির দেশে পশু কাটা এবং তার ছাল চামড়া ছাড়ানো আমাদের বাজার হাট করার মতই একটা দৈনন্দিন ব্যাপার। **সেখানকার ছেলেরা ও মেয়েরা ছোট বেলা থেকেই পশু কাটতে অভ্যস্ত। তাই সেখানকার সকলেই কসাই এবং তাদের মধ্যে নৃশংসতাও একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। আগেই বলা হয়েছে নবী মহম্মদ বিদায় হজের সময় এক নাগাড়ে ৬৩ টা উট কোরবানী করেছিলেন। পশুপালক সমাজের মানুষ ছিলেন বলেই নবীর পক্ষে ওই নৃশংসতা অথবা ৮০০ কুরাইজাকে একদিনের মধ্যে কোতল করার মত নৃশংস কাজ করা সম্ভব হয়েছিল।** ইসলামের উদ্দেশ্য হল, আরবের পশুপালক সমাজের ওই নৃশংসতা অন্যান্য দেশের মুসলমানদের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া, কারণ **জিহাদ করতে এই নৃশংসতা ও নিষ্ঠুরতা দরকার।** এই কারণেই আমাদের দেশের একজন নিরীহ চাষী মুসলমান হলে তার মধ্যেও আরবের নৃশংসতা জন্ম নেয়।

রমজান মাসে মুসলমানরা সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কিছু খায় না, এমনকি জলও না। একমাস এই উপবাস করাকে বলে রোজা। হিন্দুরাও অনেকে একাদশী, পূর্ণিমা, অমাবস্যা ইত্যাদি তিথিতে উপবাস করেন। কিন্তু তাঁরা উপবাস শুরুর আগে পেটভরে খেয়ে উপবাস শুরু করেন না। কিন্তু

মুসলমানরা রোজার মাসে অনেক রাত থাকতে উঠে রান্না করে সূর্য ওঠার আগে পেট ভরে খেয়ে নিয়ে উপবাস শুরু করে।

যাই হোক, অনেক হিন্দু ভাবে যে, মুসলমানরা কত ধর্মপ্রাণ এবং তারা তাদের আল্লার জন্য এক মাস ধরে উপবাস করে কত কষ্ট স্বীকার করে। প্রথমেই সেই সব হিন্দুকে বলা দরকার যে, **এই রোজা রাখার মধ্যে কোন আধ্যাত্মিকতা নেই**। আগেই বলা হয়েছে যে, **মুসলমানদের অন্তিম আধ্যাত্মিক প্রাপ্তি হল আল্লার পতিতালয় বা জান্নাতে প্রবেশ করা** এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লা কলেমা গ্রহণ করার জন্য **অত্যন্ত পতিত মুসলমানও জান্নাতে যাবে**। রোজা রাখা না রাখার জন্য জান্নাতে যাবার কোন সম্পর্ক নেই। **তাহলে তারা এক মাস ধরে রোজা রাখে কেন?** এর উত্তর হল, জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য রোজার প্রয়োজন না থাকলেও জিহাদের জন্য রোজার প্রয়োজন আছে। **যেই আরব দেশে ইসলামের আবির্ভাব হয়েছিল, সেখানে জলের বড়ই অভাব। অনেক সময় এমন হত যে, আল্লার বান্দারা জিহাদ করতে দূরে কোথাও গেল, সারাদিন ধরে যুদ্ধ করলো। কিন্তু খাবার দূরে থাক, তৃষ্ণা মেটাতে এক ফোটা জলও পাওয়া গেল না। ওই সব পরিস্থিতিকে মোকাবেলা করার জন্যই এক মাস ধরে পানাহার পরিত্যাগ।** এটাও সামরিক শিক্ষার একটি অঙ্গ এবং সামরিক বাহিনীতে এর নাম Endurance Training বা প্রতিকূলতাকে মানিয়ে নেবার প্রশিক্ষণ।

মাক্কি ও মাদানি আয়াত

আগেই বলা হয়েছে মুসলমানরা নানাভাবে হিন্দুদের বোকা বানায়। তারা ইসলামকে শান্তি বলে, কাফের মানে নাস্তিক ব্যক্তি বলে এবং জিহাদ মানে মানুষের মধ্যকার শুভ ও অশুভ প্রবৃত্তির মধ্যে যুদ্ধ বলে হিন্দুদের বোকা বানায়। তারা আরও এক ভাবে হিন্দুদের ঠকায়। কোরাণের কিছু কিছু আয়াত আছে যেগুলো ততটা হিংস্র নয় বরং কিছুটা নিরীহ ও সহিষ্ণু। যেমন **"আল্লা অত্যাচারীদের ভালবাসেন না"** (৩/১৪০); **"অত্যাচারীদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি আছে** (১৪/২২); **যারা অশান্তি উৎপাদন করে, আল্লা তাদের ভালবাসেন না"** (৫/৬৪); **"আল্লা উদ্ধত ও অহংকারীদের ভালবাসেন না"** (৫৭/২৩) ; **"কেউ ধৈর্যধারণ করলে ও ক্ষমা করলে তা বীরত্বের কাজ"** (৪২/৪৩); **"তোমার ধর্ম তোমার কাছে (প্রিয়), আমার ধর্ম আমার কাছে (প্রিয়)"** (১০৯/৬); **"আল্লার বাণী প্রচার করাই রসুলের একমাত্র কাজ"** (৫/৯৯) ইত্যাদি ইত্যাদি। এই সব আয়াত শুনে অনেক কাফেরই প্রতারিত হয়। ভাবে তাই তো, কোরাণে অনেক ভাল ভাল আয়াতও তো রয়েছে। এই সব প্রতারণার কাজে মুসলমানরা উপরিউক্ত "তোমার ধর্ম তোমার....আমার কাছে" (১০৯/৬) বহুল প্রয়োগ করে থাকে এবং ইসলামকে পরধর্ম সহিষ্ণু দেখাতে চেষ্টা করে।

সমগ্র কোরান ১১৪ সুরা বা অধ্যায়ে বিভক্ত এবং প্রতিটি সুরা কতগুলি বাক্য বা আয়াতে বিভক্ত। সমগ্র কোরান শরীফে মোট ৬১৪১টি আয়াত আছে এবং এগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা চলে, মাক্কি ও মাদানি। **হিজরতের আগে মক্কায় অবতীর্ণ আয়াতগুলিকে মাক্কি আয়াত এবং হিজরতের পরে মদিনায় অবতীর্ণ আয়াতগুলিকে মাদানী আয়াত বলে।** নবী মহম্মদের ব্যক্তিগত জীবনযাত্রা এবং তাঁর চিন্তা ভাবনার দ্বারা এই আয়াতগুলো ভীষণভাবে প্রভাবিত। হিজরতের আগে নবী ছিলেন মাত্র একজন পত্নী বিবি খাদিজার স্বামী। নবী হিসাবেও তখন তাঁর তেমন খ্যাতি ও প্রতিপত্তি হয়নি। মক্কায় তখন মুসলমানের সংখ্যাও ছিল মুষ্টিমেয় কয়েকজন। তাই তখন গায়ের জোরে বলপূর্বক কাউকে মুসলমান করা ছিল কল্পনার অতীত। সেই কারণে

তখন তাঁর কাজ ছিল সম্পূর্ণ অহিংস পদ্ধতিতে মক্কার অধিবাসীদের কাছে আল্লাতায়লার বাণী পৌঁছে দেওয়া। তাদেরকে আল্লার ক্রোধ, শেষ বিচার ও নরকের ব্যাপারে সতর্ক করে দেওয়া।

কিন্তু হিজরৎ করে মদিনায় যাবার পর নবী হলেন একাধারে মদিনার প্রধান প্রশাসক, প্রধান বিচারক এবং সর্ব্বোচ্চ সেনা নায়ক। এক কথায় মদিনার সর্বময় কর্তা। তিনি ইতিমধ্যে তার চাচা হামজা, চাচাত ভাই আলি ও যুবায়ের এবং আরও অন্যান্য অনুগতদের সাহায্যে ভয়ঙ্কর একটা গুণ্ডার দল তৈরি করে ফেলেছেন। তখন থেকেই তরবারির দ্বারা ইসলাম প্রচার নীতি হিসাবে গৃহীত হল এবং নবী জিহাদের তত্ত্ব আমদানি করলেন। হিজরীর দ্বিতীয় বছরে (৬২৪ খ্রীঃ) বদরের যুদ্ধে ১০০০ লোকের মুসলমান বাহিনী ৩০০০ জনের কোরেশ বাহিনীকে অলৌকিকভাবে পরাজিত করায় মুসলমানদের মনোবল অসম্ভব বৃদ্ধি পেল এবং **নবী মদিনায় আতঙ্ক সৃষ্টি করে তরবারির সাহায্যে ইসলাম প্রচার শুরু করে দিলেন।**

আল্লাও নবীর মনোভাব বুঝতে পেরে জিহাদের ভয়ঙ্কর আয়তগুলি অবতীর্ণ করতে শুরু করলেন। মক্কায় থাকাকালীন আল্লা মুসলমানদের পক্ষে যুদ্ধ করা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু সেই আল্লাই তখন মুসলমানদের যুদ্ধ করার অনুমতি দিলেন। শুধু তাই নয়, সক্ষম মুসলমানদের জন্য যুদ্ধ আবশ্যিক ঘোষণা করলেন। মদিনার ব্যাপারে আল্লা প্রথমেই বলে রাখলেন, **"আমি কোন জনপদে নবী পাঠালে সেখানকার অধিবাসীদের দুঃখ ও ক্লেশ দ্বারা পীড়িত করি, যাতে তারা বিনত হয়"**। এবং এই বাণীর (কোরাণ-৭/৯৪) দ্বারা মদিনাবাসীদের ওপর যথেচ্ছ অত্যাচার ও উৎপীড়ন করার অধিকার আল্লা নবীর হাতে তুলে দিলেন। এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে, **"তিনি (আল্লা) তাঁর রসুলকে পথ নির্দেশ ও সত্য ধর্ম সহ প্রেরণ করেছেন, অপর সমস্ত ধর্মের উপর একে জয়যুক্ত করার জন্য"** (৪৮/২৮) বাণীর দ্বারা ইসলামকে তরবারির সাহায্যে অন্য সমস্ত ধর্মের ওপর প্রভূত্ব করার নির্দেশ দিলেন। তারপর একে একে জিহাদের অন্যান্য ভয়ঙ্কর আয়াত সমূহ অবতীর্ণ করতে থাকলেন (জিহাদ অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

মুসলমানরা যখন কোন ভদ্র সমাজে ইসলাম সম্বন্ধে কথা বলে তখন শুধু

মাক্কি আয়াতগুলোই বলে এবং এইভাবে ইসলামের রক্তাক্ত তরবারিটা গোপন রাখে। গত ২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার পর টিভি ও খবরের কাগজের রিপোর্টাররা অনেক মুসলমান সাংবাদিক, ধর্মীয় নেতা ও রাজনৈতিক নেতাদের সাক্ষাৎকার নেয়। **সব ক্ষেত্রেই মুসলমানরা শুধু মাক্কি আয়াতগুলো তুলে ধরে কাফের সাংবাদিকদের প্রতারিত করে।** কোন দেশে বা অঞ্চলে মুসলমানরা যতদিন সংখ্যালঘু থাকে, ততদিন তারা শুধু মাক্কি আয়াতগুলো বলে সংখ্যা গুরুদের প্রতারিত করতে থাকে। যেই মুহূর্তে মুসলমানরা সংখ্যাগুরু হয়ে যায়, সেই মুহূর্তেই তারা মাক্কি আয়াতগুলো ফেলে দিয়ে জিহাদের রক্তাক্ত মাদানী আয়াতগুলো প্রচার করতে থাকে।

আমাদের দেশের মুসলমানরাও যখন হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় যায় তখন মাক্কি আয়তগুলো ব্যবহার করে। যেই মাত্র তারা নিজেদের মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় ফিরে যায়, তখন তারা জিহাদের মাদানী আয়তগুলো ব্যবহার করতে থাকে। বাংলাদেশের সীমানার নিকটবর্তী যে সব এলাকায় আজ মুসলমানের সংখ্যা বেশি, সেখানকার মসজিদগুলো থেকে মাইক সহযোগে জিহাদের মাদানী আয়াতগুলো মুসলমানরা দিন রাত প্রচার করে চলেছে।

মন্দির বনাম মসজিদ

অনেক হিন্দু আবার মন্দির শব্দের সঙ্গে মসজিদ শব্দটা এমনভাবে উচ্চারণ করেন যেন মন্দির আর মসজিদ একই বস্তু। মন্দিরও ধর্মস্থান আর মসজিদও ধর্মস্থান। কাজেই যাহা মন্দির তাহাই মসজিদ। কিন্তু বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করলে দেখা যাবে যে **মন্দির আর মসজিদের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য বিদ্যমান**। একটা বিশেষ প্রভেদ যা আজ সকলেরই নজরে পড়ছে তা হল, মুসলমান সন্ত্রাসবাদীরা কাশ্মীরের মসজিদগুলোতে আশ্রয় নিচ্ছে। কিন্তু হিন্দুর কোন সন্ত্রাসবাদী দলও নেই, আর তারা কোনদিন কোন মন্দিরে আত্মগোপন করেছে এমন সংবাদও নেই।

আগেই বলা হয়েছে যে হিন্দু যাকে ধর্ম বলে, ইসলাম সেরকম কোন ধর্ম নয়। প্রকৃতপক্ষে **ইসলাম হল একটি রাজনৈতিক মতবাদ, যার উদ্দেশ্য হল পৃথিবী ব্যাপী এক ইসলামী সাম্রাজ্য গড়ে তোলা এবং মসজিদগুলো হল ইসলামের পার্টি অফিস। মসজিদগুলোতে জিহাদ ও কাফের হত্যার পরিকল্পনা তৈরি করা হয় এবং জিহাদের অস্ত্রশস্ত্র যথা রাইফেল, বন্দুক, পিস্তল, গোলাগুলি, নানারকম বিস্ফোরক মজুদ করা হয়।** হিন্দুরা তাদের কোন মন্দিরকে এরকম অস্ত্রাগার হিসাবে ব্যবহার করেছে এমন সংবাদ আজও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

আগেই বলা হয়েছে যে, হিজরত করে মদিনা আসার পর নবী মহম্মদ একাধারে মদিনার প্রধান শাসক, প্রধান বিচারক এবং প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ হয়েছিলেন। মদিনার মসজিদে বসেই নবী তাঁর উপরিউক্ত দায়িত্বগুলি পালন করতেন। কাজেই সেই সময় **মদিনার মসজিদ ছিল প্রধান সরকারী কার্যালয়, প্রধান বিচারালয় এবং প্রধান সামরিক কার্যালয়। নবী তাঁর ১০ বছর মদিনা বাসকালে ৮২টা যুদ্ধ ও হত্যা, আক্রমণ, লুণ্ঠনের অভিযান করেন। এই সমস্ত অভিযানের পরিকল্পনা মদিনার মসজিদেই তৈরি করা হয়েছিল। তাছাড়া মহিলা কবি আসমা, কবি আবু আফাক ও কবি কাব বিন আসরাফ-এর মতো মদিনার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের গুপ্তহত্যার পরিকল্পনাও নবী মদিনার মসজিদে বসেই রচনা করেছিলেন।** কোন হিন্দু ধর্মগুরু মন্দিরকে এ সমস্ত হীন চক্রান্ত

ও সামরিক কাজে ব্যবহার করেছেন বলে শোনা যায়নি।

সেই সময় মদিনার আউস, খাজরাজ ইত্যাদি গোত্রের আরব ও নজির, কানুইকা ও কুরাইজা গোত্রের ইহুদীদের বাস ছিল। নিজেদের অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে তাদের পক্ষে সর্বসম্মতভাবে মদিনার কোন ব্যক্তিকে মদিনার শাসনকর্তা মনোনয়ন করা সম্ভব হয় না। সেইজন্য তারা মক্কার ধর্মপ্রচারক নবী মহম্মদকে মদিনায় ডেকে নিয়ে আসে এবং তাকে শাসক মনোনীত করে। তারা ভেবেছিল, মহম্মদ যেহেতু একজন পয়গম্বর, তাই তিনি একজন পক্ষপাতহীন ও ন্যায়পরায়ণ শাসক হবেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তাদের সেই ভুল ভেঙে গেল। মহম্মদ তার সহচরদের সাহায্যে গুণ্ডা বাহিনী তৈরি করে এক সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করলেন এবং এর ফলে প্রকারান্তরে **মুসলমানরাই মদিনার হর্তাকর্তা হয়ে বসল এবং মদিনার মূল অধিবাসীরা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হল।** মদিনার লোকরা যখন বুঝল যে, এ তো খাল কেটে কুমীর আনা হয়েছে, তখন অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে মদিনার দুই কবি, আবু আফাক ও কাব বিন আসরাফ এবং মহিলা কবি আসমা, কবিতা লিখে মদিনাবাসীদের সচেতন করার চেষ্টা করতে লাগলেন এবং মুসলমানদের হাত থেকে মদিনার স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনার জন্য সাধারণ মানুষকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষ করার জন্য ঐক্য বদ্ধ হবার আহ্বান জানাতে লাগলেন। স্বভাবতই তাদের ওই সব কবিতা মহম্মদের কাছে বিরক্তিকর হয়ে উঠল। কিন্তু প্রকাশ্য দিবালোকে তাদের হত্যা করতেও নবী ভয় পেলেন, কারণ ওই সব কবিরা ছিলেন বেশ প্রভাবশালী। কাজেই **যে রাস্তা খোলা থাকল, তা হল গুপ্ত হত্যা। নবী মদিনার মসজিদে বসেই তাঁর সাঙ্গপাঙ্গদের সাথে এই সব গুপ্ত হত্যার পরিকল্পনা তৈরি করেন। খুনীরা মসজিদে নবীর সঙ্গে দেখা করেই এই সব কাজে যাত্রা করে এবং হত্যা করে আসার পর খুনীরা মসজিদে ফিরে আসে এবং নবী ওই মসজিদেই তাদের স্বাগত জানান।** হিন্দুরা তাদের কোন মন্দিরকে এই সব হীন কাজে ব্যবহার করেছে এমন কোন সংবাদ আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। আগেই বলা হয়েছে যে, ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগষ্ট মুসলমানরা শুক্রবার বা জুমআর নামাজের পরে মসজিদ থেকেই হিন্দুদের ওপর আক্রমণ শুরু করেছিল।

হিন্দুরা তাদের মন্দিরকে কোনদিন এই সব হীন কাজে ব্যবহার অতীতেও করেনি, আর ভবিষ্যতেও করবে না।

ইসলামে নবীই হলেন সকল রকম আচার আচরণের আদর্শস্থল। নবী খাবার পর হাত চেটে পরিষ্কার করতেন, তাই সব মুসলমানকে হাত চেটে পরিষ্কার করতে হবে। আরবে জল দুর্মূল্য, তাই নবী অল্প জল দিয়ে যে ভাবে অজু করতেন, জলের দেশ বাংলাতেও ঠিক একইভাবে কম জল দিয়ে অজু করতে হবে। নবী কুকুর দেখতে পারতেন না, তাই কোন মুসলমান কুকুর পুষতে পারবে না। পাজামার ঝুল গোড়ালি ঢেকে ফেললে নবী তাকে অহমিকার প্রকাশ বলে মনে করতেন, তাই খাটো পাজামা পরতে হবে। নবী দাবা খেলা পছন্দ করতেন না, বলতেন, যে দাবা খেলে তার হাত শূয়োরের রক্তে মাখামাখি হয়ে যায়। তাই কোন মুসলমান দাবা খেলতে পারবে না। মুসলমানদের যাতে সহজে চেনা যায় তাই নবী তাদের গোঁফ কামিয়ে দাঁড়ি রাখতে বলেছেন। তাই সব মুসলমানকে গোঁফ কামিয়ে দাঁড়ি রাখতে হবে। নবীকে অনুসরণ করাই ইসলাম, কারণ আল্লা বলেছেন, "সর্বদা নবীকে অনুসরণ কর"। তাই **কোন যুক্তি বিচারের স্থান ইসলামে নেই। ইসলামের অর্থ শুধু অন্ধের মত আল্লার কোরাণ ও আল্লার নবীকে অনুসরণ কর।** তাই নবী মদিনার মসজিদকে যে যে কাজে ব্যবহার করে গিয়েছেন, আজও মুসলমানরা মসজিদকে সেই সেই কাজে ব্যবহার করে চলেছে। আজও ইমামরা মসজিদ থেকে ফতোয়া জারি করছে। **মসজিদে বসেই তারা কাফের হত্যা, কাফের নারীদের অপহরণ ও কাফেরদের মন্দির ধ্বংস করার পরিকল্পনা তৈরী করছে।** বর্তমান বাংলাদেশে মসজিদকে আরও একটা পাশবিক কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। **ইমামদের কুপ্রস্তাবে কোন গ্রাম্য বধূ রাজি না হলে, তার বিরুদ্ধে ব্যাভিচারের মিথ্যা অভিযোগ এনে তাকে মসজিদে ধরে এনে আগুন দিয়ে, নয় তো পাথর ছুড়ে মেরে ফেলা হচ্ছে।** হিন্দুরা কোনদিন কোন মন্দিরকে এই সব জঘন্য কাজে ব্যবহার করেছে বলে শোনা যায়নি।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, হিন্দুর মন্দির ও মুসলমানের মসজিদের মধ্যে পাহড় প্রমাণ ব্যবধান বিদ্যমান। জীবিতকালে নবী মদিনার মসজিদকে আরও একটা কাজে ব্যবহার করতেন। **জিহাদ করে আনা লুটের মাল মসজিদেই**

জমা করা হত এবং তা জিহাদীদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হত। তখন নবী নিজে ওই লুটের মালের এক পঞ্চমাংশ নিতেন এবং বাদবাকি লুটের মাল সব জিহাদীদের মধ্যে সমানভাগে ভাগ করা হত। আগেই বলা হয়েছে যে, ধরে আনা মহিলারাও লুটের মাল বলে গণ্য হত। সব থেকে সুন্দরী মহিলাটি নবীর ভোগে লাগত। বাকিদের জিহাদীরা ভাগ করে নিত। কোন মন্দিরকে এই সব জঘণ্য ও জানোয়ার সুলভ কাজে ব্যবহার করার কথা হিন্দুদের চিন্তার বাইরে এবং হিন্দুর উপাস্য দেবতারাও এই জঘণ্য নারকীয় কাজে উৎসাহ দেন না। হিন্দুরা তাদের মন্দিরকে পূজা অর্চনার কাজে ; ভক্তি নিবেদনের কাজেই ব্যবহার করে এসেছে এবং ভবিষ্যতেও তাই-ই করবে।

ইসলাম ও বিজ্ঞান

কোন মানুষ ইসলাম কবুল করে মুসলমান হলে নিশ্চয়ই সেই ব্যক্তির জিনগত (genetic) পরিবর্তন হয় এবং এর ফলে সে হয়ে উঠে চরম নির্লজ্জ ও মিথ্যাবাদী। মুহম্মদ নুরল ইসলাম এই রকম এক ব্যক্তির নিদর্শন। একজন জন্ডিসে আক্রান্ত রোগী যেমন সব কিছুই হলুদ দেখে, এই নুরল ইসলাম মহাশয়ও কোরানের প্রতি পাতায় বিজ্ঞান দেখছেন এবং এ থেকে তিনি সিদ্ধান্তে এসেছেন আল্লা হলেন বিশাল এক বিজ্ঞানী। তাই শ্রী নুরল ইসলাম মহাশয় "বিজ্ঞান না কোরআন"[72] নামে প্রায় ৩৫০ পৃষ্ঠার বিশাল এক কেতাব লিখে ফেলেছেন যা পাঠ করে তাঁর ধর্মভাইরা অতিশয় উল্লসিত হবে, কিন্তু কোন কাফেরের কাছে তা জঞ্জাল ছাড়া আর কিছুই মনে হবে না।

কোরাণে কত খানি বিজ্ঞান আছে এবং আল্লা কত বড় বৈজ্ঞানিক, তা একজন অমুসলমানের মুখ থেকে শুনলে কিছুটা বিশ্বাস করা চলত। কিন্তু কোন গাঁজাখোরের মুখে গাঁজার প্রশংসা বা কোন মদখোর মাতালের মুখে মদের প্রশংসা শুনে এই সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয় যে, গাঁজা ও মদ অত্যন্ত উপকারী ও উপাদেয় বস্তু। যাই হোক, নুরল ইসলাম নামক পাগলের প্রলাপ বর্ণনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। ইসলাম কতটা বৈজ্ঞানিক বা কোরাণে কতখানি বিজ্ঞান আছে, তা তাদের সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা করলেই পাঠকের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে। কোরাণে বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্ব বাইবেল-এর "জেনেসিস" অধ্যায় বর্ণিত সৃষ্টিতত্ত্বের অনুরূপ। কোন এক শনিবারে আল্লা তাঁর সৃষ্টিকার্য শুরু করে ছয় দিনের মধ্যে তা সমাপ্ত করেন এবং শুক্রবার জুমআর দিন তিনি বিশ্রাম গ্রহণ করেন । মহম্মদ বিশ্বাস করতেন যে, বৃহস্পতিবারের মধ্যে সব সৃষ্টি করে আল্লা শুক্রবারে আসরের নামাজের পর প্রথম মানব হজরৎ আদম (সংস্কৃত আদিম থেকে উৎপন্ন)-কে সৃষ্টি করেন (মুসলীম হাদিস-৬৭০৭)। (এ ব্যাপারে উৎসাহী পাঠক বর্তমান লেখকের 'ইসলামী ধর্মতত্ত্ব ঃ এবার ঘরে ফেরার পালা" গ্রন্থের 'ইসলামী সৃষ্টিতত্ত্ব" অধ্যায় দেখতে পারেন)।

72. Mullick Brothers, Kolkata.

যাই হোক, কোরাণ ও অন্যান্য গ্রন্থে ইসলামী সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে যে সব বর্ণনা দেওয়া আছে তা হল, আল্লা প্রথমে জল সৃষ্টি করেন এবং তারপর মাটি সৃষ্টি করে তাকে জলের উপর স্থাপন করেন। কিন্তু দেখা গেল জলের উপরে মাটি ঠিক স্থির হয়ে বসছেনা, তাই পরম প্রজ্ঞাময় আল্লা পাহাড় পর্বত সৃষ্টি করলেন এবং সেগুলোকে পেরেক হিসাবে ব্যবহার করে নড়বড়ে মাটিকে দৃঢ় করলেন। তারপর **তিনি পৃথিবীর ওপরে শক্ত আচ্ছাদন হিসাবে আকাশ সৃষ্টি করলেন এবং বিশেষ কুদরতের সাহায্যে কোন স্তম্ভ ছাড়াই সেই কঠিন ছাদরূপী আকাশকে স্থাপন করতে সক্ষম হলেন।** তবে শেষ বিচার বা কেয়ামতের দিন আল্লা সেই ছাদরূপী আকাশকে ভেঙ্গে ফেলবেন এবং তখন তা গুড়ো হয়ে ধূলোর আকারে পৃথিবীতে এসে পড়বে।

সব থেকে বড় কথা হল, আকাশের উপরেই স্বর্গের অবস্থান এবং ফেরেস্তা জিব্রাইল সেই স্বর্গ থেকেই কোরাণের বাণী নিয়ে আসতেন এবং আবার স্বর্গে ফিরে যেতেন। তাই অবাক হতে হয় যে এই কঠিন ছাদরূপী আকাশকে ভেদ করে জিব্রাইল কি ভাবে যাতায়াত করত। আর মেরাজের দিন নবীই বা কি করে আকাশ ভেদ করে স্বর্গে গিয়েছিলেন।

তারপর আল্লা সূর্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করলেন এবং তাদের পূর্ব দিকে উদয় হতে এবং পশ্চিম দিকে অস্ত যেতে বাধ্য করলেন। তবে **কেয়ামতের দিন আল্লা সূর্যকে পশ্চিম দিকে উদিত করবেন।** এখানে আরও একটা কথা বলা দরকার। এই সব সৃষ্টি করতে আল্লার কোন কাঁচামালের দরকার হয় না। কি সৃষ্টি করবেন তা মনে করে আল্লা "কুন" বললেই সব হয়ে যায়। এত সহজেই সব হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও "মুসলমানগুলো মানুষ হোক," এই মনে করে আল্লা কেন "কুন" বলছেন না তা বিস্ময়কর। যাই হোক আকাশের উপরেই স্বর্গ এবং সেখানে স্বর্গবাসীরা আলোর ফানুস হাতে করে বসে আছে এবং আমরা তাকে তারা বা নক্ষত্র বলি। কেয়ামতের দিন ওই সব আলোর ফানুসও পৃথিবীতে পতিত হবে। এই সব সৃষ্টি করতে আল্লার ২ দিন লাগল। বাকী চার দিন তিনি মানুষের জন্য জীবিকা (আহার্য্য) সৃষ্টি করলেন। কাজেই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, কোরাণে কত বিজ্ঞান আছে এবং আল্লা কতবড় বিজ্ঞানী (কোরাণ-(৭/১৭১),

(১০/৩), (১১/৭), (১৩/২), (৩১/১০), (৩২/৪), (৫০/৩৮) ও (৫৭/৪)।

প্রশ্ন থেকে যায়, আল্লা কতদিন আগে তাঁর এই মহান সৃষ্টিকার্য করেছেন? ইসলামী মতে আল্লা এক জোড়া নরনারী আদম ও হাওয়াকে সৃষ্টি করেছেন এবং আজকের মানবজাতি ওই আদম ও হাওয়ারই বংশধর। এবং নবী মহম্মদ ছিলেন হজরৎ আদমের ৯০তম বংশধর। কাজেই দুই পুরুষের মধ্যে ৩০ বছর বয়সের ব্যবধান ধরলে এই সিদ্ধান্ত করতে হয় যে, আদমের ২৭০০ বছর পরে নবীর জন্ম হয়। ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে নবী মহম্মদের জন্ম। অর্থাৎ নবী জন্মেছিলেন আজ থেকে ১৪৩৪ বছর আগে। তাই সিদ্ধান্তে আসতে হয় যে, **আজ থেকে মাত্র ৪১৩৪ বছর আগে আল্লা এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন।** কাজেই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, আল্লা যদি কোন দিন তাঁর বান্দাদের মানুষ করেন তবে সবথেকে বেশি উপকৃত হবেন মহান বিজ্ঞানী শ্রী মুহাম্মদ নুরল ইসলাম মহাশয়।

অনেক পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, আল্লা (এবং বাইবেলের গড) হঠাৎ ৬ দিনের মধ্যে সৃষ্টিকার্য সম্পন্ন করলেন কেন। কেন তা, এক দিন কমে ৫ দিন বা ১দিন বেড়ে ৭ দিন হল না। তাই এ ব্যাপারে দু একটি কথা বলা সঙ্গত হবে। হিন্দু কালগণনা অনুসারে আজ থেকে ১৯৭ কোটি ১২ লক্ষ ২১ হাজার ১০৫ বছর আগে বর্তমান শ্বেতবারাহ কল্প শুরু হবার মধ্য দিয়ে বর্তমান সৃষ্টির সূত্রপাত হয়েছে। ১৪ মনুতে এক কল্প হয় এবং এক কল্পের মান ৪৩২ কোটি বছর। সুতরাং ৩০ কোটি ৮৪ লক্ষ ৪৮ হাজার বছরে এক মনু (বা মন্বন্তর) হয়। তাই হিসাব করলে দেখা যাবে শ্বেতবারাহ কল্প শুরু হবার পর থেকে ৬টা মনু পার হয়ে গেছে এবং বর্তমানে ৭ম মনু বৈবস্বত চলছে। **এই সব তত্ত্ব যখন নিরক্ষর পশুপালক ইহুদীদের কাছে গেল তখন সেই মূর্খের দল ৬ মনুকে ৬ দিন বুঝে নিল** এবং যা বুঝলো, তা বাইবেলে লিখে দিল এবং নবী মহম্মদ তা বাইবেল থেকে কোরাণে নিয়ে এলেন।

নবী মহম্মদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ইসলামের সঙ্গে নবী মহম্মদের জীবন এত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত যে, তাঁর জীবনী না জানলে ইসলাম বিষয়ে জ্ঞান সম্পূর্ণ হয় না। **বিগত ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে আগষ্ট বা ১২ই** রবিউল, সোমবার, **মক্কানগরীর সুগুল্লাইল এলাকায় নবী হজরৎ মহম্মদের জন্ম হয়।** তাঁর জন্মের কয়েক মাস আগে পিতা আবদুল্লা মারা যান। কোরেশ বংশের রীতি অনুসারে মহম্মদ ধাত্রীমাতা (বা দুগ্ধমাতা) হালিমার কাছে বড় হতে লাগলেন। মহম্মদের বয়স যখন ৪ বছর, তখন থেকেই তিনি পশু চরাণো শুরু করেন। এই সময় একদিন **ফেরেস্তারা মহম্মদের বুক চিড়ে জমজমের পানিতে তাঁর হৃৎপিণ্ড ধুয়ে নির্মল করে দেয় এবং এই ঘটনা ছিনাচাক নামে খ্যাত** (কোরাণ-৯৪/১)। এখানে বলে রাখা দরকার যে **৬২১ খ্রীষ্টাব্দে মেরাজ বা স্বর্গ ভ্রমনের আগে ফেরেস্তারা আরও একবার তাঁকে ছিনাচাক করে** । বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, **বারবার দুবার হৃদয় নির্মল করার পরও মহম্মদ সমগ্র পৃথিবীকে নর রক্তে কর্দমাক্ত করার এক তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিলেন, আরবের কাফেরদের গণহত্যা, ৮০০ কুরাইজা ইহুদীর গণহত্যা, খয়বর আক্রমণ করে নজির গোষ্ঠীর ইহুদীদের গণহত্যা, ৮ জন উকল বেদুইনের বীভৎস হত্যা, বিদায় হজের সময় এক নাগাড়ে ৬৩টা উট কোরবানী, ৫২ বছর বয়সে ছয় বছরের শিশু আয়েশাকে নিকা, ৫৮ বছর বয়সে পালিত পুত্র যায়েদের ৩৫ বছর বয়স্কা পত্নী জয়নবকে নিকা এবং উপপত্নী মারিয়া সহ ১২ জন পত্নীর হারেম তৈরী করার মত কত মহৎ কাজ করতে পেরেছিলেন।** কাজেই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, **ফেরেস্তারা এক বারও ছিনাচাক না করলে তিনি মহান কীর্তির বন্যা বইয়ে দিতেন।**

যাই হোক, মহম্মদের বয়স যখন ৬ বছর, তখন মা আমিনা মারা যান। তখন থেকেই অনাথ (আতিম) মহম্মদ চাচা আবুতালেবের তত্ত্বাবধানে মাঠে ময়দানে পশু চরাণোর কাজ করে বড় হতে লাগলেন। এই ভাবে তাঁর বয়স যখন ২৫ বছর হল তখন অভিজাত বংশীয়, ধনী, ৪০ বছর বয়স্কা বিধবা খাদিজার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। এই বিবাহ মহম্মদের জীবনে একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বা mile-stone বলা যেতে পারে। কারণ এর ফলে হত

দরিদ্র মহম্মদ অভাব অনটনের হাত থেকে মুক্তি পেলেন।

মহম্মদের পিতামহ আব্দুল মোত্তালেব ধার্মিক প্রকৃতির লোক ছিলেন এবং পুরো রমজান মাস মক্কা থেকে প্রায় ৩ কিমি দূরে হেরা পর্বতের এক গুহায় নির্জনে কাটাতেন। মহম্মদের বয়স যখন ৪০ বছর, তখন তিনি ও ঠিক করলেন পিতামহের সেই গুহায় তিনিও কয়েক দিন কাটাবেন। সেখানে অবস্থান কালে, ২৭শে রমজান সবেবরাতের রাত্রে ফেরেস্তা জিব্রাইল (বাইবেলের গ্যাব্রিয়েল) ৬ লক্ষ ডানা বিশিষ্ট স্বমূর্তিতে সেখানে উপস্থিত হয়ে বলল, "**হে আল্লার রসুল, আপনি পড়ুন।**" মহম্মদ বললেন, "**আমি নিরক্ষর, পড়তে জানি না**"। তখন জিব্রাইল নিজেই পাঠ করলেন, "**তুমি তোমার প্রতিপালকের নামে পাঠ কর, যিনি সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষকে রক্ত পিণ্ড থেকে সৃষ্টি করেছেন। তুমি পাঠ কর, তোমার প্রতি পালক মহিমান্বিত। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে জানতো না**" (কোরাণ-৯৬/১-৫) । এই হল আল্লার প্রথম ওহী (প্রত্যাদেশ), যা ফেরেস্তা জিব্রাইল সবেবরাতের রাত্রে নবী মহম্মদকে পড়ে শুনিয়েছিল। সবথেকে বড় কথা হল, এই বাণীর মধ্য দিয়ে স্বয়ং আল্লার যে প্রজ্ঞা প্রকট হয়েছে তারপর কারও পক্ষে অবিশ্বাস করার কোন উপায় থাকে না যে, এই বাণী স্বয়ং ঈশ্বরের বাণী নয়। তা সত্ত্বেও যদি কেউ অবিশ্বাস করে তখন তার ধড় থেকে মাথাটা নামিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কিবা করা যেতে পারে! এ ব্যাপারে যদি কেউ নবীকে অবিশ্বাস করে বলে যে, "জিব্রাইল এসেছিল কি না, তার তো কোন সাক্ষী ছিল না"! তা হলে নবীর বিরুদ্ধে কুৎসা করার অপরাধে সেই কাফেরেরও ধড় থেকে মাথাটা নামিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কিবা করা যেতে পারে? এখানে আরও একটা বিষয় লক্ষ্য করার আছে। আরবের নিরক্ষর পশুপালকদের কাছে উপরিউক্ত বাণী প্রজ্ঞাময় আল্লার বাণী বলে বিশ্বাস করা বিচিত্র ব্যাপার নয়। কিন্তু আমাদের দেশের ধর্মান্তরিত মুসলমানদের বেলায় সে কথা খাটে না। কোরানের বাণীকে আল্লার বাণী বলে বিশ্বাস করার জন্য তাদের বিচার বিবেচনা ও বুদ্ধি-সুদ্ধির স্তরকে পিতৃ-পিতামহের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া স্তর থেকে অনেক নীচে নামিয়ে আরবের বেদুইনদের স্তরে নিয়ে আসতে হয়েছে তা বলাই বাহুল্য।

যাই হোক, মহম্মদের এই নবীত্ব বা নবুয়ৎ প্রাপ্তি স্ত্রী খাদিজা, পরে চাচাত ভাই আলি এবং বন্ধু আবুবকর সর্বপ্রথম বিশ্বাস করে ইসলাম কবুল করল। ক্রমে আরও কয়েক জন মুসলমান হল , কিন্তু মক্কার কোরেশদের সঙ্গে বিবাদ তীব্রতর হতে লাগল। সেই সময় কোরেশরা ছিল বহু দেবদেবীর পূজারী এবং মক্কার কাবায় তখন ৩৬০টি দেবদেবীর মূর্ত্তি ছিল। কিন্তু মহম্মদের আল্লার একেশ্বরবাদ ওই সব দেবদেবীর অস্তিত্বকে অস্বীকার করায় কোরেশদের মান-সম্মান ও অর্থনীতির উপরও আঘাত করা হল। ফলে তারা মহম্মদকে হত্যার পরিকল্পনা করল।

অনেকের মতে মক্কার কোরেশরা ভারতীয় কুরুবংশের ক্ষত্রিয় ছিল এবং সেই সময় আরবদেশের সব মানুষ হিন্দু ছিল। মক্কার কাবা তখন মক্কেশ্বর শিবের মন্দির ছিল এবং কাবার ভিতরের ৩৬০ টি মূর্ত্তি সব হিন্দু দেব দেবীর মূর্ত্তি ছিল। কাবার ভিতরে যে শিবালিঙ্গ ছিল, কোন এক দুর্ঘটনায় তা ভেঙ্গে যায় এবং আজও তার অংশবিশেষ কাবার মধ্যে বিদ্যমান, যার নাম হাজরে-আসোয়াদ। মক্কাজয়ের পর মহম্মদ কাবার ৩৬০টি মূর্ত্তি ধ্বংস করলেও, হাজরে আসোয়াদকে অসম্মান করতে ভয় পান। তাই শিবলিঙ্গের ভগ্নাবশেষ সেই হাজরে আসোয়াদকে মুসলমানরা হজের সময় গিয়ে পুজা করছে আর ভারতে ফিরে সেই শিবলিঙ্গের পুজোকে মূর্তিপুজো বলে নিন্দা করছে। সংস্কৃতে ঘোড়ার এক নাম অর্ব এবং আরবের নাম ছিল অর্বদেশা । সেই অর্বদেশ থেকেই বর্তমান আরব শব্দ এসেছে বলে অনেকে মনে করেন।

মুসলমানদের দৃষ্টিতে ইসলামের আগে আরবে যে সংস্কৃতি ও ধর্ম ছিল তা হল জাহেলিয়া বা অজ্ঞতার অন্ধকার। সেই কারণে ইসলামীকরণের পরে আরবের লোকেরা তাদের নিজস্ব প্রাক-ইসলামী ইতিহাস সম্বন্ধে কৌতূহল হারিয়ে ফেলে। এটা শুধু আরবের ক্ষেত্রেই নয় পরে যেই সব দেশে ইসলামীকরণ হয়েছে, সেই সব দেশেও ওই একই অবস্থা। এই কারণে মিশরের প্রাক-ইসলামী সভ্যতার আজ কোন দাবিদার নেই। আজ যেখানে ইরাক, এক কালে সেখানেই গড়ে উঠেছিল প্রাচীন মেসোপটেমিয়ার সভ্যতা। কিন্তু ইসলামীকরণের ফলে সেই সভ্যতার কোন দাবিদার আজ আর ইরাকে নেই। ভারতের ধর্মান্তরিত মুসলমানদের ক্ষেত্রেও এই কথা সমানভাবে প্রযোজ্য।

বিদেশী বর্বর মুসলমানদের দ্বারা বিজিত হওয়ার আগের ইতিহাস সম্বন্ধে ওই সব ধর্মান্তরিত মুসলমানদের কোন আগ্রহ নেই, কারণ তাদের শেখানো হয়েছে যে, ভারতে তখন জাহেলিয়া ছিল।

অনেকের মতে **শিবের মাথার চন্দ্র থেকে মুসলমানদের বা ইসলামের চাঁদ তারা চিহ্ন এসেছে। হজ করার সময় হাজীদের সেলাই বিহীন কাপড় পরতে হয়। দুখন্ড কাপড় থাকে। এক খন্ড পরতে হয়, আর এক খন্ড গায়ে দিতে হয়, যাকে আরবীতে ইহরাম বলে। এবং হজ শেষ করার পর সব হাজীকে মস্তক মুণ্ডন করতে হয়। হজের সময় হাজীদের কাবা গৃহকে ৭ বার প্রদক্ষিণ করতে হয়, যাকে আরবীতে তাওয়াফ বলে। যে কেউ হাজীদের, এই ইহরাম পরা, কাবাকে প্রদক্ষিণ করা এবং মস্তক মুন্ডন করা দেখলে তাকে বলে দেবার প্রয়োজন হবে না যে ওগুলো হিন্দু রীতি যা ইসলাম অটুট রেখেছে।** অনেকের মতে সম্রাট বিক্রমাদিত্য দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময় আরব তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

তুরস্কের ইস্তানবুল শহরে মাকতেব-এ-সুলতানিয়া নামে একটি গ্রন্থাগার আছে, যেখানে পশ্চিম এশিয়ার অনেক প্রাচীন পুঁথি রাখা আছে। এরকম একটি পুঁথির নাম সায়র-উল-ওকুল, যার মধ্যে প্রাক ইসলামী আরবের কবিদের রচিত অনেক কবিতা স্থান পেয়েছে। সেই গ্রন্থে নবী মহম্মদের এক চাচা উমর-বিন-হাসনাম-এর একটি কবিতা আছে। সেই কবিতাটি এক বার মক্কার নিকটবর্তী ওকাজের মেলায় শ্রেষ্ঠ কবিতা বলে বিবেচিত হয়ে ছিল। নীচে কবিতাটির ৬টি পংক্তি প্রথমে আরবীতে এবং পরে তার বঙ্গানুবাদ দেওয়া গেল—

ওয়া আহ্‌লোলাহা আজাহু আর্মিমান মহাদেব ও,
মানাজেল ইলামুদ্দিনে মিনজুম ওয়া সয়াত্তারু,
ওয়া সাহাবি কেয়ম ফিম্ কামিল হিন্দে ইয়োমান,
ওয়া ইয়াকুলুন লাতাহাজান ফৈন্নাক তারাজ্জারু।
মায়াসেয়ারে আখলাকান হাসনান কুল্লাহুম্,
নাজুমুন অজ্জাত্ সুম গবুল হিন্দু।[73]

---

73. A. Ghosh, ibid, 167.

অর্থাৎ যদি কেউ অন্তত একবারও শ্রদ্ধাভরে মহাদেবের পূজা করে, তবে সে ন্যায় ও আধ্যাত্মিকতার চরম শিখরে পৌঁছে যেতে পারে। হে প্রভু, তুমি আমার এই জীবন নিয়ে নাও এবং বদলে আমার এই প্রার্থনা পূরণ কর যে, আমি অন্তত পক্ষে এক দিনের জন্যও হিন্দে (ভারতে) যেতে পারি এবং সেখানকার আধ্যাত্মিকতার পবিত্র পরিবেশে নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারি। (কারণ) হিন্দে তীর্থ করার ফলে মানুষ অনেক মহৎ কাজ করার পুণ্য অর্জন করে এবং সেখানকার পুণ্যাত্মা শিক্ষকদের স্পর্শে জীবন সার্থক করতে পারে।

যাই হোক প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে মহম্মদ বন্ধু আবুবকরকে সঙ্গে করে মদিনায় পালিয়ে গেলেন। মদিনায় যাবার আগেই খাদিজার মৃত্যু হয় এবং মহম্মদ সৌদা নাম্নী এক প্রৌঢ়াকে নিকা করেন। মদিনায় আসার ফলে মহম্মদের জন্য সকল পার্থিব সুখের দরজা যেন অকস্মাৎ খুলে গেল। তিনি মদিনার একছত্র অধিপতি হলেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে নবী বা পয়গম্বর হিসাবেও তার খ্যাতি প্রতিপত্তি হল। মক্কায় এক নাগাড়ে ১৫ বছর খাদিজার সঙ্গে নিষ্ঠার সাথে ঘর করার ফলে অনেকের মনে হতে পারে যে, নবী বুঝি খুব সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক ছিলেন। কিন্তু আসল ব্যাপার হল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তাঁর পক্ষে তখন দ্বিতীয় কোন পত্নী গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। কারণ তিনি ছিলেন খাদিজার আশ্রিত। Sir W. Muir-এর মতে তখনকার স্বর্গ কল্পনা এবং হাজার হাজার হুরী পরীর মধ্যে দিয়ে নবীর সুপ্ত ও অতৃপ্ত যৌন কামনাই ফুটে উঠেছে।

যাই হোক, মদিনায় আসার পর মহম্মদ যেমন বৈষয়িক দিক থেকে স্বচ্ছল হলেন, সেই সঙ্গে সঙ্গে খাদিজার মৃত্যু তাঁকে দিল বহু আকাঙ্খিত মুক্তি। তখন থেকেই নবী একের পর এক নিকা করতে লাগলেন। হিজরীর প্রথম বছরে ৬ বছরের শিশু আয়েশাকে, তৃতীয় বছরে হাফসা ও জয়নবকে, চতুর্থ বছরে হিন্দকে, পঞ্চম বছরে পালিত পুত্র যায়েদের স্ত্রী জয়নবকে এবং জয়েরিয়া নাম্নী ক্রীতদাসীকে এবং সপ্তম বছরে উম্মে হাবিবা, সাফিয়া, মাইমুনা ও মিশরীয় ক্রীতদাসী মারিয়াকে নিকা করে ১২জন বিবির হারেম তৈরি করলেন।

যেই বছর নবী হিজরৎ করে মক্কায় এলেন, তার আগের বছর, ৬২১ সালের রজব মাসের ২৭ তারিখে নবীর মেরাজ বা স্বর্গ ভ্রমণ নামক এক অলৌকিক ঘটনা ঘটে। **নবী পার্থিব কয়েক ঘন্টার মধ্যে সশরীরে, জাগ্রত অবস্থায়, খচ্চরের থেকে ছোট কিন্তু গাধার চেয়ে বড়, ডানাওয়ালা স্বর্গীয় প্রাণী বোরাকে চড়ে স্বর্গভ্রমণ করেন।** এই স্বর্গভ্রমণের ব্যাপারটা আল্লা কোরাণের বাণী অবতীর্ণ করে (কোরান-১৭/১) সমর্থন করেছেন, তাই সন্দেহের কোন অবকাশ থাকতে পারে না। ইসলাম বা খ্রীষ্টমত অনুযায়ী ভূ-মণ্ডলের পর চন্দ্র মণ্ড ল, তারপর সূর্যমণ্ডল, তারপর নক্ষত্র মণ্ডল এবং তারপর স্বর্গের অবস্থান। আজকাল বিজ্ঞানীরা কয়েক লক্ষ আলোকবর্ষ থেকে কয়েক কোটি আলোকবর্ষ দূরের নক্ষত্র আবিষ্কার করছেন। তাই আল্লার স্বর্গও অত দূরে চলে যেতে বাধ্য। তাই নবী পার্থিব কয়েক ঘন্টার মধ্যে লক্ষ লক্ষ আলোকবর্ষ দূরের স্বর্গ ভ্রমণ করেছেন তা অবিশ্বাস্য মনে হবারই কথা। কিন্তু আল্লা যখন কোরানের বাণী অবতীর্ণ করে তা সমর্থন করেছেন, তখন অবিশ্বাস করবে কে? তা সত্ত্বেও যদি অবিশ্বাস করে তাহলে তাকে নবীর বিরুদ্ধে কুৎসা করার অপরাধে সেই কাফেরের ধড় থেকে মুন্ডুটা নামিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কি করা যেতে পারে?

এই সব আলোচনা থেকে এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, আমরা হিন্দুরা যে সমস্ত ধার্মিক ব্যক্তি বা ধর্মপ্রচারকের সঙ্গে পরিচিত, আরবের নবী মহম্মদের সঙ্গে তাদের ঘোরতর অমিল। আমাদের ধার্মিক ব্যাক্তিরা একটা ইঁদুর মারতে পারবেন কি না সন্দেহ, সেখানে নবী মহম্মদের সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ৮০০ কুরাইজার কোতল দেখতে কোন অসুবিধা হয় না। রাত্রে আবার সেই কোতল করা লোকগুলোর কোন এক জনের স্ত্রীর সঙ্গে শয়ন করতে যাওয়া হিন্দুদের পক্ষে চিন্তা করাই সম্ভব নয়। কিন্তু আরবের নবীর পক্ষে তাতে কোন অসুবিধা হয় না। খয়বর আক্রমণ করে যেই দলপতি কিনানার বুকে কাঠ জ্বালিয়ে বাতাস দিলেন, যুদ্ধের শেষে মৃতদেহ ছড়ানো সেই রক্তাক্ত প্রান্তরে সেই কিনানার বিধবা স্ত্রী সফিয়াকে নিকা করতে এবং সেই রাতেই তার সাথে শয়ন করতে আরবের নবীর কোন অসুবিধা হয় না। পৌত্রী স্থানীয়া শিশু আয়েশাকে এবং কন্যা স্থানীয়া পুত্রবধূ জয়নবকে নিকা করতেও আরবের

নবীর কোন অসুবিধা হয় না।

হিন্দু ধার্মিক ব্যক্তিরা মরার সময় ভগবানের নাম করতে করতে মরবেন, এটাই স্বাভাবিক। গীতা বলছে ,যে যা চিন্তা করতে করতে মারা যাবে, পরের জন্মে সে তাই হয়ে জন্মাবে। তাই আরবের নবী মহম্মদ কি ভাবে ইন্তেকাল করেছেন তা জানতে পাঠকের কৌতূহল জাগা স্বাভাবিক। নবী মহম্মদের মৃত্যু বর্ণনা করতে বিবি আয়েশা বলেছেন-"আল্লার রসুল আমার পালার দিন, আমার ঘরে, আমার কোলে মাথা রেখে ইন্তেকাল করেছেন, এবং মৃত্যু কালে তাঁর লালা ও আমার লালা তখন মেশামেশি হয়ে গিয়েছিল"[74]। কোন হিন্দু ধার্মিক ব্যক্তি এই ভাবে মারা গেলে হিন্দুরা তাঁকে প্রকৃত ধার্মিক ব্যক্তি বলে কখনোই মনে করতেন না।

---

74. Bukhari Sharif, Hadis No. 4096 (as mentioned in Kabar Pathe by Abdul Aziz al Aman, II, 447).

উপসংহার

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটা পরিষ্কার হচ্ছে যে, হিন্দুরা যাকে ধর্ম বলে জানে, ইসলাম সে রকম কোন ধর্ম নয়। ইসলাম হল অত্যন্ত বর্বর, খুনী ও হিংস্র এক তত্ত্ব দ্বারা অনুপ্রাণিত অত্যন্ত অমানবিক একটি রাজনৈতিক মতবাদ, যা মানুষকে নানারকম অমানবিক অসৎ কাজ এবং অপরাধ করতে উৎসাহ দেয়। ইসলাম হল এমন একটি পাশবিক মতবাদ, যা মানুষের মধ্যেকার মানবিকতাকে হরণ করে সেখানে পশুত্বের স্থাপনা করে। প্রকৃতপক্ষে ইসলাম হল সব রকমের খুনী, গুণ্ডা ও অন্ধকার জগতের মানুষের আশ্রয়স্থল এবং এর স্বর্গীয় বাণী সমূহ, যা কোরানে লিপিবদ্ধ করা আছে, তাও criminal বা অপরাধমূলক। সেই সঙ্গে ইসলাম হল মানবিকতা ও সভ্যতার চরমতম শত্রু। ইসলাম চায় হিন্দু সহ দুনিয়ার সমস্ত অমুসলমানকে হত্যা করতে অথবা মুসলমান করতে এবং যেই সব দুষ্ট লোকেরা উচ্ছিষ্টের লোভে বা আরবের উৎকোচের দ্বারা চালিত হয়ে ইসলামকে বিকৃতভাবে উপস্থাপিত করে হিন্দুসহ সমস্ত অমুসলমানকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন, তাদের ধিক্কার জানাবার মত সঠিক শব্দ বাংলা ভাষায় আছে বলে মনে হয় না। এই সব লোকেরা এভাবে যে অপরাধ এবং দেশ ও জাতির প্রতি যে বিশ্বাসঘাতকতা করে চলেছেন তারও কোন পরিমাপ হয় না। এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, যে মুহূর্তে মুসলমানরা ভারতে সংখ্যা গরিষ্ঠ হবে এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করবে, সেই মুহূর্তেই তারা হিন্দুর সমস্ত মন্দির ধ্বংস করবে, অথবা তাদের মসজিদে রূপান্তরিত করবে এবং হিন্দুর সমস্ত ধর্মগ্রন্থ জ্বালিয়ে দেবে, ভারতের মাটি থেকে মানবিকতা অন্তর্হিত হবে এবং ভারতবর্ষ কাফের নিধনের এক বধ্যভূমিতে পরিণত হবে।

এই কারণে প্রত্যেকটি হিন্দুর উচিত হিন্দুধর্মের চরম শত্রু ইসলামকে জানা। বিশেষ করে ইসলামের আক্রমণাত্মক ও কাফের নিধনের নীতি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান অর্জন করা। হিন্দু যদি মেকি সেকুলারবাদীদের সামপ্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার বাণীতে মুগ্ধ হয়ে থাকে বা আর এক দল মূর্খের "সর্বধর্ম সমন্বয়"-এর বাণীতে মশগুল হয়ে থাকে, তাহলে এই ভারতবর্ষ এক দিন ইসলামী

ভারতবর্ষ হবেই হবে। কেউ তাকে রোধ করতে পারবে না ।

শত্রুর সঙ্গে লড়তে গেলে সবার আগে দরকার শত্রুকে জানা। শত্রুর শক্তি এবং দুর্বলতা কোথায় লুকিয়ে আছে সে ব্যাপারে সম্যক জ্ঞান অর্জন করা। এই কারণেই সব দেশের গুপ্তচর বাহিনী থাকে। মেঘনাদের নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে যাবার সংবাদ যদি শ্রীরাম গুপ্তচর মারফৎ না যোগার করতেন, তবে লক্ষ্মণের পক্ষে সেখানে গিয়ে তাকে হত্যা করা সম্ভব হত না। তাই ইসলামের হাত থেকে হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু সংস্কৃতিকে রক্ষা করার প্রথম ধাপই হল হিন্দু ধর্মের চরম শত্রু ইসলামকে জানা।

সেই সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা বিষয় খেয়াল রাখা দরকার। বর্তমান ইসলামী সন্ত্রাসবাদ শুধু হিন্দু বা আমেরিকার মানুষদের ক্ষতি করছে তা নয়, ইসলামী সন্ত্রাসবাদ পৃথিবীর সমস্ত অমুসলমানের ও মানব সভ্যতার শত্রু। **সেই কারণে আমেরিকা সেই নারকীয় ইসলামী সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম শুরু করেছে, আমেরিকার সেই প্রচেষ্টাকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করা সব হিন্দুর একান্ত কর্তব্য।** এটা অমানবিকতার বিরুদ্ধে মানবিকতার, অসভ্যতার বিরুদ্ধে সভ্যতার এবং পশুত্বের বিরুদ্ধে মনুষ্যত্বের লড়াই। তাই সব হিন্দুকে এই লড়াইয়ে আমেরিকার পাশে দাঁড়াতে হবে, যাতে পৃথিবীর **মাটি থেকে ইসলামের মত একটা অমানবিক ও হিংস্র তত্ত্বকে চিরকালের মত উপড়ে ফেলা যায়। পৃথিবীর সমস্ত উদীয়মান বিন লাদেনকে যমালয়ে পাঠানো যায়।**

ইসলাম সম্পর্কে দুজন খ্যাতনামা ব্যক্তির মন্তব্য নীচে দেওয় গেল।

স্যার যদুনাথ সরকার—"একটা ধর্ম (ইসলাম) যা তার অনুসরণকারীদের শেখায় যে, খুন ও ডাকাতি তার ধর্মীয় কর্তব্য, সেই ধর্ম মানব জাতির সভ্যতা ও অগ্রগতির পরিপন্থী এবং বিশ্বশান্তির শত্রু"। (History of Aurangzib, Orient Longman (1972), III, 168)

স্যার উইলিয়াম মুর—"কোরান ও মহম্মদের তরবারি মানব সভ্যতা, স্বাধীনতা ও আজ পর্যন্ত মানুষ যাকে সত্য বলে জানে, সে সকলের সর্বাপেক্ষা অনমনীয় শত্রু"। (Life of Mahomet, Voice of India, (1992), 522)

পরিশিষ্ট - ১

রক্তপিপাসু ইসলাম ও হিন্দুর ভবিষ্যৎ

বিগত প্রায় এক বছর ধরে বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর যে জঘন্য অত্যাচার চলছে তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। নারী, শিশু, বৃদ্ধ , বৃদ্ধা নির্বিশেষে ঠাণ্ডা মাথায় নিরীহ হিন্দুদের হত্যা করা হচ্ছে। ঘরে আগুন দিয়ে সেই আগুনের মধ্যে শিশুদের ছুঁড়ে ফেলা হচ্ছে। পরিবারের সবাইকে ঘরে বন্ধ করে সেই ঘরে আগুন দিয়ে সবাইকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হচ্ছে। মায়ের কোল থেকে শিশুকে ছিনিয়ে নিয়ে মাটিতে আছড়ে দেওয়া হচ্ছে। মাথাটা নারকোলের মত ফাটানো হচ্ছে। স্বামী ও ভাইদের সামনে মা ও মেয়েকে এক সঙ্গে বলাৎকার করা হচ্ছে। মেয়েদের স্তন ও ছেলেদের পুরুষাঙ্গ কেটে ফেলা হচ্ছে। **হাতুড়ী দিয়ে সারা গায়ে পেরেক ঢুকিয়ে মা-বাবার সামনে শিশুকে নির্মমভাবে হত্যা করা হচ্ছে। লোহা গরম করে মেয়েদের যৌনাঙ্গে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে বা সেখানে অ্যাসিড ঢালা হচ্ছে।** আরও যে সব অত্যাচার হচ্ছে তা লেখা সম্ভব নয়।

এসব অত্যাচারের কাহিনী পড়লে প্রথমেই মনে হয়, কোন মানুষের মধ্যে সামান্যতম মনুষ্যত্ব, সামান্যতম মানবিকতা থাকলেও সে এইসব নৃশংস ও হিংস্র কাজ করতে পারে না। একমাত্র রক্ত-পিপাসু হিংস্র জানোয়ারদের পক্ষেই এসব কাজ করা সম্ভব। কাজেই প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে তারা তো একই দেশের মানুষ, একই দেশ মায়ের সন্তান এবং একই ভাষায় কথা বলে। কিন্তু সেই মানুষগুলোকে এরকম হিংস্র জানোয়ারে পরিণত করল কে?

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হল, তারা একই রকম দেখতে, একই ভাষায় কথা বলে এবং একই দেশের মানুষ হলেও তারা মুসলমান। এককালে তারাও হিন্দু ছিল। খুঁজলে দেখা যাবে যে, আজ থেকে ৫০ কিংবা ১০০ কিংবা ২০০ বছর আগে তাদের বাপ-ঠাকুরদারা কলমা পড়ে, ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়েছিলেন। আর এই ইসলামই তাদের ভিতর থেকে মনুষ্যত্বকে হরণ করে সেখানে পশুত্বের স্থাপনা করেছে । তাদের এক একটি হিংস্র জানোয়ারে পরিণত করেছে। কারণ ইসলামের উদ্দেশ্যই হল মানুষকে জানোয়ারে পরিণত করা। কাজেই প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, কি ভাবে এবং কোন পদ্ধতির মধ্য দিয়ে ইসলাম

প্রতিটি মুসলমানকে জানোয়ারে পরিণত করে?

হিন্দু ধর্ম বলে, সব মানুষই সমান। সব মানুষের মধ্যেই ভগবান আছেন। তাই কাউকে ঘৃণা করতে নেই। কাউকে কষ্ট দিতে নেই। কিন্তু ইসলাম বলছে, যারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লা' কলমা গ্রহণ করে ইসলাম কবুল করেছে, তারা হল মুসলমান বা মোমেন। আর যারা এই কলমা গ্রহণ করেনি, যারা কোরাণ ও আল্লার রসুল মহম্মদে বিশ্বাস করে না, তারা হল কাফের। আল্লা শুধু মুসলমানদেরই ভালবাসেন এবং কাফেরদের তিনি চরমভাবে ঘৃণা করেন। শেষ বিচার বা কেয়ামতের দিন আল্লা সমস্ত কাফেরদের নরকের আগুনে নিক্ষেপ করবেন। পক্ষান্তরে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লা' কলমা গ্রহণ করার জন্য আল্লা মুসলমানদের পাহাড়প্রমাণ পাপ ক্ষমা করে দেবেন। অত্যন্ত পাপাসক্ত ও অধঃপতিত মুসলমানকেও আল্লা তার জান্নাতে বা স্বর্গে নিয়ে যাবেন।

তাই কোরাণ বলছে—"আল্লার দৃষ্টিতে এই কাফেররা হল অত্যন্ত ঘৃণিত জীব ও ঈশ্বরহীন পশু" (কোরাণ-৭/১৭৯)। "এরা নিষ্ঠুরভাবে বধযোগ্য" (ঐ-৩৯/৩০-৩২)। "এদের যেখানে পাবে বন্দী করবে ও হত্যা করবে" (৪/৮১-৯১)। আল্লা এদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন" (ঐ-৪/১৪৭-৪৮; ৮/১০-১৪)। "কোরাণে অবিশ্বাস করার ফলে এরা সকলেই নরকের আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে" (ঐ-৩/৮৫)। "সেখানে আল্লা তাদের অনন্তকাল ধরে আগুনে ঝলসাবেন এবং প্রত্যেকবার ঝলসাবার পর আল্লা আবার নতুন চামড়ার সৃষ্টি করবেন। যাতে তারা অবিরাম শাস্তি ভোগ করতে পারে।" (ঐ-৪/৫৬)।

আল্লার দৃষ্টিতে কাফেররা এতই ঘৃণিত যে, কাফেরদের ও কাফের মহিলাদের ওপর যে কোন নারকীয় অত্যাচার করার অধিকার তিনি মুসলমানদের দিয়ে রেখেছেন। লুটপাট করে তাদের সহায়-সম্বল, ধন-সম্পদ ও জায়গা-জমি আত্মসাৎ করার অধিকার তিনি মুসলমানদের দিয়ে রেখেছেন। কুমারী, সধবা, বিধবা, যে কোন রকমের কাফের রমণীর ওপর বলাৎকার করার অধিকারও আল্লা তাদের দিয়ে রেখেছেন। মুসলমানরা কাফেরদের ওপর অত্যাচার করলে, আল্লার দৃষ্টিতে তা হবে পুণ্যের কাজ। কাফেরদের ওপর যে যত বেশি হিংস্র অত্যাচার করবে, আল্লার খাতায় তার জন্য তত বেশি পুণ্য বা সোয়াব লেখা হবে। এই সব কাজের জন্য আল্লা তাদের চরমভাবে পুরস্কৃত করবেন। যে মুসলমান কমপক্ষে

একজন কাফের হত্যা করবে সে হবে 'গাজী'। আল্লার জান্নাতে এই গাজীরা হবেন বিশিষ্ট অতিথি। সেই খুনীদের আল্লা সসম্মানে সর্ব্বোচ্চ স্বর্গ বা জান্নাৎ-ই-ফেরদৌসে নিয়ে যাবেন সেখানে অনন্তকাল থাকার ব্যবস্থা করবেন।

হিন্দু ধর্ম বলে—সত্য কথা বলবে, সত্য পথে চলবে, সৎ ও পবিত্র জীবন-যাপন করবে, কাম, ক্রোধ ও লোভ ত্যাগ করবে এবং তবেই ভগবানের কৃপা, করুণা ও আশীর্বাদ পাবে। কিন্তু ইসলাম বলছে তার পথটাই আসল। ইসলাম কবুল করে মহম্মদের সত্যধর্ম গ্রহণ করাই সঠিক পথ। আর সব পথই ভুল পথ। আল্লাই আসল ভগবান, আর সবই মেকি ভগবান। তাই ভুলপথে থেকে মেকি ভগবানের আরাধনা করে কোনই লাভ নেই। ভুল পথে থাকার ফলে কাফেরদের সমস্ত সৎ কাজ ও সৎ জীবন-যাপন নিষ্ফল হয়ে যাবে।

পক্ষান্তরে, মহম্মদের সত্যধর্ম গ্রহণ করে সঠিক পথে চলার জন্য আল্লা মুসলমানদের সমস্ত দুষ্কর্ম ও পাপ ক্ষমা করে দেবেন। আদর করে তাদের জান্নাতে (স্বর্গে) নিয়ে যাবেন। সেইখানে তারা দুধের নহর (খাল) থেকে দুধ, মধুর নহর থেকে মধু এবং মদের নহর থেকে যত ইচ্ছা মদ খাবে। আর খাবে সুস্বাদু স্বর্গীয় খাবার ও ফলমূল। সেখানে একটা খেজুড় হবে ১২ হাত লম্বা। একটা আঙ্গুর থেকে পাওয়া যাবে এক মশক রস। সেখানে তারা যা খাবে তা সবই হজম হয়ে যাবে। তাই মলমূত্র ত্যাগের প্রয়োজন হবে না।

সেই আল্লার জান্নাতে মুসলমানদের বয়স ৩২ বছরের বেশি বাড়বে না। তাই তারা চির যৌবন পাবে। সেখানে প্রত্যেক মুসলমান পাবে হাজার হাজার হুরী বা স্বর্গীয় রমণী। হরিণ-নয়না সেই সব সুন্দরীদের আল্লা আলোর দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। তাদের গায়ের রং ডিমের খোলার মত। তাদের গা থেকে ছড়ায় মৃগনাভির গন্ধ। তারা যে সব কাপড় জামা পরে থাকবে তার বাইরে থেকে ভিতর দেখা যাবে।

আল্লার সেই জান্নাতে প্রত্যেক মুসলমান পাবে একখানা করে মুক্তার প্রাসাদ। সেই প্রাসাদে থাকবে ৭০টি চূনীর বাড়ী। প্রত্যেক বাড়ীতে থাকবে ৭০টি পোখরাজের মহল। প্রত্যেক মহলে থাকবে ৭০টি ঘর। প্রত্যেক ঘরে থাকবে ৭০টি কার্পেটে ঢাকা ৭০টি আরাম কোদারা। এবং প্রত্যেক আরাম কোদারায় বসে থাকবে একজন করে হুরী। আল্লা প্রত্যেক মুসলমানকে অসীম যৌনক্ষমতা

দেবেন, যাতে সে প্রত্যেকটি হুরীর সঙ্গে যৌনক্রিয়া করতে পারে। কোন হুরীর সঙ্গে যৌনক্রিয়া শুরু করলে তা ৪০ বছর স্থায়ী হবে। তা ছাড়া সমকাম বা পায়ুকাম করার জন্য প্রত্যেকটি মুসলমান পাবে ৮০,০০০ হাজার স্বর্গীয় কিশোর। এদের বয়স কখনও ১৬ বছরের বেশি বাড়বে না, তাই তারা চিরকিশোর থাকবে।

কাজেই মুসলমান সমাজ হচ্ছে এমন এক সমাজ, যেখানে শিশু বয়স থেকেই একজন মুসলমানকে শেখানো হচ্ছে যে, কাফেররা হল মুসলমানদের চরমতম শত্রু। তাই তাদের ওপর অত্যাচার করা পুণ্যের কাজ। কাফের নারীদের বলাৎকার করা পুণ্যের কাজ। কাফেরদের ধন-সম্পত্তি ও জায়গা-জমি লুটপাট করা পুণ্যের কাজ। এবং কাফের হত্যা করা সর্বাপেক্ষা পুণ্যের কাজ। আর এই সব পুণ্যের কাজের পুরস্কার হিসাবে তাদের সামনে রাখা হয়েছে ইহলোকে কাফেরদের থেকে লুট করে আনা ধন-সম্পত্তি বা গণিমতের মাল এবং পরলোকে জান্নাত নামক আল্লার পতিতালয়ের যৌন স্বেচ্ছাচার।

কাজেই বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় যে, নিতান্ত শিশু বয়স থেকে কোন মানুষকে এই ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুললে তার ফল কি হতে পারে। বাস্তবিক পক্ষে এই ইসলামী শিক্ষাই ধীরে ধীরে একজন মুসলমানকে অত্যন্ত পাপাসক্ত এবং রক্তপিপাসু হিংস্র জানোয়ারে পরিণত করে। এখানে আরও লক্ষ্য করার বিষয় হল, যে মানুষগুলোর সামনে ইহলোকের জন্য কাম্য হিসাবে রাখা হয়েছে লুটের মাল এবং পরলোকের জন্য আকাঙ্খা রাখা হয়েছে আল্লার বেশ্যাখানা, তারা মানুষ হবে কেমন করে? (পরিশিষ্ট ২ দ্রষ্টব্য)

হিন্দু ধর্ম বলে, সৎ কর্ম, সৎ চিন্তা, সৎ সংসর্গ, পরোপকার ও ভগবানের আরাধনার মধ্য দিয়ে মনকে পবিত্র করতে হবে এবং আত্মার উন্নতি করতে হবে। হিন্দু বিশ্বাস করে যে, এটাই ধর্মের লক্ষ্য এবং এভাবে সাধনার দ্বারা মানুষ ঈশ্বরত্ব লাভ করে পুনর্জন্ম-চক্র থেকে মুক্তি পেতে পারে। এই মুক্তি বা মোক্ষলাভই হল হিন্দুর ধর্মাচরণের অন্তিম লক্ষ্য এবং চূড়ান্ত আধ্যাত্মিক প্রাপ্তি।

কিন্তু ইসলামের লক্ষ্য কি? মানুষের আত্মার উন্নতি, আধ্যাত্মিক উন্নতি, ইত্যাদি ব্যাপারে ইসলামের কোন মাথাব্যথা নেই। ইসলামের অন্তিম লক্ষ্য হল, পৃথিবীরর সমস্ত কাফেরদের নির্বিচারে হত্যা করে, রক্ত গঙ্গা বইয়ে দিয়ে সমস্ত পৃথিবীতে ইসলামের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করা। সমস্ত পৃথিবীকে দার-উল-ইসলামে

পরিণত করা। সমস্ত পৃথিবীতে ইসলামের পতাকা উড্ডীন করা। সব ধর্মকে নিশ্চিহ্ন করে সমগ্র পৃথিবীতে ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করা। এরই নাম হল 'জিহাদ'।

তাই কোরাণ বলছে,---**"হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা আল্লা ও তার রসুলে বিশ্বাস স্থাপন কর এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দ্বারা আল্লার পথে জিহাদ (যুদ্ধ) কর। ইহাই তোমাদের পক্ষে কল্যাণকর। আল্লা তোমাদের সব পাপ ক্ষমা করবেন এবং তোমাদের জান্নাতে দাখিল করবেন। ইহাই মহাসাফল্য"** (কোরাণ--৬১/১১-১২)। **"আল্লা তাঁর রসুলকে সুপথ ও সত্যধর্ম প্রেরণ করেছেন এবং তিনিই একে সকল ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত করবেন"** (ঐ-৬১/৯)। **"তোমরা জিহাদ করতে থাক, যতক্ষণ না আল্লার ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়"** (ঐ-৮/৩৯)।

গত ২রা সেপ্টেম্বর, ২০০৪, সংখ্যার দেশ পত্রিকায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রাক্তন উপাচার্য তাঁর "ধর্মসমন্বয় চিন্তা" নামক প্রবন্ধে লিখলেন যে ইসলামের মধ্যেও নাকি মহৎ এবং স্থায়ী এক দার্শনিক তত্ত্ব আছে। কিন্তু আশ্চর্যের কথা হল কোন গ্রন্থে সেই স্থায়ীতত্ত্ব বলা হয়েছে তার কোন সূত্র তিনি দেননি। মোহন দাস করমচাঁদ গান্ধী এই সমস্ত বুদ্ধিজীবীদের সামনে মহৎ হবার যে আদর্শ রেখে গিয়েছেন তা হল, (১) ইসলামের মহত্ত্ব কীর্তন কর, (২) হিন্দুদের অহিংসার নামে কাপুরুষ করতে চেষ্টা কর এবং (৩) যে কোন প্রসঙ্গেই হোক, হিন্দু ধর্মের নিন্দা কর, কুৎসা কর। আমাদের মাননীয় প্রাক্তন উপাচার্য মহাশয় যে এ পথের পথিক তাতে কোন সন্দেহ নেই। উপরন্তু, এই পথে চললে পাওয়া যায় আরবের উচ্ছিষ্ট। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, আরবের সেই উচ্ছিষ্টের লোভেই উপরিউক্ত মাননীয় ব্যাক্তি মহাশয়, যিনি ইসলাম বিষয়ে এক মহামূর্খ, এই সমস্ত পাগলের প্রলাপ লিখে কাগজ কালির অপব্যয় করেছেন। এই জঞ্জাল লিখে এই ধরনের ব্যক্তিরা হিন্দু সমাজের যে সমূহ ক্ষতি করে চলেছেন তাকে ধিক্কার জানাবার মত সঠিক শব্দ বাংলায় আছে বলে মনে হয় না। এই সমস্ত ব্যক্তিবর্গের মিথ্যা কথার শিকার হয়েই প্রতি বছর বহু হিন্দু যুবতী মুসলমান যুবককে বিয়ে করে ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় করছে। কারণ এই সব হিন্দু যুবতীদের কেউ বলে না যে, একেক জন মুসলমান চার জন স্ত্রী রাখতে পারে।

তাই সেই হিন্দু যুবতীকে তিন জন সতীনের সঙ্গে ঘর করতে হতে পারে। আরও ভয়ের কথা হল, ওই মুসলমান যুবক যে কোন দিন তিনবার "তালাক" বলে তাকে, কোন খোরপোশ না দিয়েই, লাথি মেরে ঘর থেকে বিদায় করতে পারে।

যে কোন জাতিকে তার বুদ্ধিজীবীরাই সঠিক পথ দেখায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল এই যে, আজ এই পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ বুদ্ধিজীবীই হয় কোন রাজনৈতিক দল, বা কোন প্রকাশনা সংস্থা অথবা কোন গোষ্ঠীর কেনা গোলামে পরিণত হয়েছেন। তাই বাঙ্গালী হিন্দুদের সঠিক পথ দেখাবার লোকের আজ বড়ই অভাব।

উপরিউক্ত প্রাক্তন উপাচার্যের মত ব্যক্তিরা ইসলাম সম্বন্ধে কিছু না জেনেই প্রচার করে চলেছেন যে, সব ধর্মই এক। সব ধর্মের মধ্য দিয়েই নাকি ভগবানকে পাওয়া যায়। কিন্তু উপরিউক্ত আলোচনায় দেখা যাচ্ছে যে, হিন্দু যাকে ধর্ম বলে জানে, ইসলাম সে রকমের কোন ধর্ম নয়। প্রকৃতপক্ষে ইসলাম হল এক জঘন্য আসুরিক রাজনৈতিক তত্ত্ব। ইসলামের উদ্দেশ্য ভগবানকে পাওয়া নয়। ইসলামের উদ্দেশ্য জিহাদ করে সমগ্র পৃথিবীকে ইসলামের তথা আরবের সাম্রাজ্যে পরিণত করা। তাই ইসলামে জিহাদের গুরুত্ব অপরিসীম। এবং সেই কারণেই আল্লা সমস্ত সক্ষম মুসলমানের জন্য জিহাদে অংশগ্রহণ করা বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন।

এ ব্যাপারে কোরাণ বলছে—"**কাফেরদের যেখানে পাবে হত্যা করবে, তাদের জন্য ঘাঁটি গেড়ে ওঁৎ পেতে থাকবে**" (কোরাণ-৯/৫)। "**যেখানেই তাদের পাবে হত্যা করবে**" (২/১৯১)। "**তাদের গ্রেফতার কর, যেখানে পাও হত্যা কর**" (৪/৮৯)। "**কাফেরদের মধ্যে যারা তোমার নিকটবর্তী তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর। ওরা তোমাদের কঠোরতা দেখুক**" (ঐ-৯/১২৩)। "**যখন তোমরা কাফেরদের সঙ্গে জিহাদে মোকাবিলা কর, তখন তাদের গর্দানে আঘাত কর**" (৪৭/৪)। "**তাদের হত্যা কর, কিংবা তাদের শূলবিদ্ধ কর, অথবা তাদের হস্ত সমূহ ও পদসমূহ বিপরীত দিক হতে কর্তন কর, অথবা তাদের দেশ থেকে বহিষ্কার কর**" (ঐ-৫/৩৩)। "**ওরাই অভিশপ্ত এবং ওদের যেখানে পাওয়া যাবে ধরা হবে এবং নির্মমভাবে হত্যা করা হবে**" (ঐ-৩৩-৬১)।

কাজেই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, কোরাণের এই সমস্ত বাণীই মুসলমানদের

হিংস্র জানোয়ারে পরিণত করছে। কোরাণের এই সমস্ত পাশবিক নির্দেশের দ্বারা চালিত হয়েই আজ মুসলমান নামক পশুর দল বাংলাদেশের হিন্দুদের ওপর নারকীয় অত্যাচার চালাচ্ছে। নারী শিশু সহ কাশ্মীরের হিন্দুদের গুলি করে হত্যা করছে। এবং ওই সব জায়গা থেকে হিন্দুদের বিতাড়িত করছে।

শুধু তাই নয়, এই পশ্চিমবঙ্গেও যেখানে যেখানে মুসলমানরা সংখ্যায় বেশি, সেই সব জায়গাতেও জিহাদ শুরু হয়ে গিয়েছে। নিরুপায় হয়ে সেই সব অঞ্চলের হিন্দুরা প্রাণের ভয়ে জায়গা জমি ফেলে রেখে অন্যত্র পালাতে বাধ্য হচ্ছে। লুটপাট ও ডাকাতি করে মুসলমানরা তাদের সহায়-সম্বল, ধনসম্পত্তি দখল করে নিচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার এবং তার পুলিশ বাহিনী কোন পদক্ষেপ নিচ্ছে না। সরকার ভোটের লোভে মুসলমানদের তোষণ করে চলেছে। এই বামফ্রন্ট সরকারের মদতেই প্রতিদিন হাজার হাজার বাংলাদেশী মুসলমান সীমানা পেরিয়ে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে ঢুকে পড়েছে। এভাবে প্রায় ৩ কোটিবাংলাদেশী মুসলমান পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে ঢুকে পড়েছে। বাংলাদেশের সীমানা অলিখিতভাবে ২৫ থেকে ৩০ কি.মি. ভারতের মধ্যে ঢুকে গিয়েছে এবং পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী ৯টি জেলায় মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে পড়েছে।

সব থেকে আতঙ্কের ব্যাপার হল, এই প্রক্রিয়া যদি অবাধে চলতে থাকে তা হলে অচিরেই সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ মুসলমান প্রধান হয়ে যাবে। হিন্দু বাঙালীর পক্ষে দুটো রাস্তা খোলা থাকবে। (১) মুসলমান হয়ে যাওয়া অথবা (২) মৃত্যু। দেশভাগের আগে পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা কোনদিন স্বপ্নেও ভাবেনি যে, পিতৃপুরুষের ভিটেমাটি ফেলে পালাতে হবে। যাই হোক, তখন তারা পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় পেয়েছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ ইসলামী দেশ হয়ে গেলে তাঁরা কোথায় যাবেন? এই প্রশ্নটা আজ সমস্ত বাঙালী হিন্দুকেই গুরুত্ব সহকারে ভাবতে হবে। প্রথমত অনুপ্রবেশ এবং দ্বিতীয়ত একাধিক বিবাহ ও জন্ম নিয়ন্ত্রণ না করার ফলে পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানের সংখ্যা অত্যন্ত দ্রুতহারে বাড়ছে। কাজেই সমস্ত বাঙালী হিন্দুর পক্ষেই চরম বিপদের দিন ক্রমশ এগিয়ে আসছে। এখন থেকে সাবধান না হলে সে বিপদ থেকে রক্ষা পাবার আর উপায় থাকবে না।

পরিশিষ্ট - ২

বিশ্বের মুসলীম সমাজ ঃ শৃঙ্খলিত এক ক্রীতদাসের দল

জনাব ওয়াসেম সাজ্জাদ হলেন ইসলামাবাদস্থিত "মিনিস্টেরিয়াল স্ট্যাণ্ডিং কমিটি অন সাইন্টিফিক অ্যাণ্ড টেকনোলজিক্যাল কো-অপারেশন" নামক একটি বেসরকারী সংস্থার সভাপতি। বিগত ১৯৯৮ সালে তিনি একটি সভায় বলেন যে, বিশ্বের জনসংখ্যার অনুপাতে Organisation of Islamic Countries বা 'ও আই সি'-ভুক্ত মুসলীম দেশগুলোতে ৪০ লক্ষ বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ থাকার কথা। কিন্তু বাস্তবে এই সংখ্যা মাত্র ২ লক্ষ, যা আকাঙ্খিত সংখ্যার ৫ শতাংশ মাত্র। তিনি আরও বলেন যে, সারা বিশ্বে মুসলমানের সংখ্যা ১৩০ কোটি, যা পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ৩২ শতাংশ। কিন্তু এই ১৩০ কোটি মুসলমান সমগ্র বিশ্বের ১ শতাংশেরও কম বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ প্রকাশ করে। তা ছাড়া কমপিউটার বিজ্ঞান, তার সফটঅয়্যার এবং তথ্যপ্রযুক্তির মত 'হাইটেক' ক্ষেত্রে তাদের কোন অবদান নেই বললেই চলে। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও অন্যান্য সৃষ্টিশীল কাজে মুসলমান সমাজের এই ব্যাপক অনগ্রসরতার জন্য তিনি খুবই আক্ষেপ করেন।

এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে আরবের এক পণ্ডিত বলেন যে, এই অনগ্রসরতার কারণেই আরব দেশগুলোতে দেখা দিয়েছে বইপত্রের প্রচণ্ড অভাব। তিনি আক্ষেপ করে বলেন "খলিফা মামুন-এর সময় থেকে বিগত ১০০০ বছরে আরবের মুসলমানরা যে পরিমাণ বিদেশী বই অনুবাদ করেছে, স্পেনের লোকেরা মাত্র এক বছরের মধ্যেই তার থেকে বেশি বই অনুবাদ করে থাকে।"

ভারত সহ পৃথিবীর সব দেশেই মুসলমান সমাজের এই একই চিত্র। সব দেশেই নিরক্ষরতা, শিশুমৃত্যু , অপরাধ ও দারিদ্রে মুসলমানরা সকলের ওপরে। মুম্বাইয়ের 'রাহাত ও য়েলফেয়ার ট্রাস্ট'-এর সভাপতি বলেন "This darkness makes a mockery of our freedom....It is only the light of education that can banish this darkness created by ignorance"—অর্থাৎ অজ্ঞতা ও অশিক্ষার অন্ধকার মুসলমান সমাজের (রাজনৈতিক) স্বাধীনতাকে ম্লান করে দিয়েছে।...একমাত্র শিক্ষার আলোই পারে এই অন্ধকার থেকে তাদের মুক্ত

করতে।

"ইসলামিক ভয়েস" (Islamic Voice) হল বাঙ্গালোর থেকে প্রকাশিত একটি মাসিক পত্রিকা। এই পত্রিকার সম্পাদক জনাব শাদাতুল্লা খাঁ তার 'বৌদ্ধিক স্থবিরত্ব এবং তার প্রতিকার' (Intellectual Stagnation and Its Remedy) শীর্ষক সম্পাদকীয়তে লেখেন যে, "মুসলীম সমাজের বৌদ্ধিক স্থবিরত্ব খুবই পীড়াদায়ক। বিগত কয়েক শতাব্দী ধরেই বিশ্বের মুসলীম সমাজ এই বৌদ্ধিক স্থবিরত্বের শিকার হয়ে আসছে। প্রকৃতপক্ষে অশিক্ষার অন্ধকার এবং বৌদ্ধিক স্থবিরত্বই যে মুসলীম সমাজের ব্যাপক দারিদ্রের জন্য দায়ী, তাতে কোনই সন্দেহ নেই।" এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে দিল্লী-স্থিত 'ইণ্ডিয়ান ইসলামিক কাউন্সিল' নামক সংস্থার সভাপতি জনাব হিসামুল সিদ্দিকি বলেন, "ভারতের মুসলমানদের প্রায় ৩৬ শতাংশ শহরে বাস করে। এদের প্রায় সকলেই বস্তিবাসী (Slum dwellers) এবং দারিদ্রসীমার নীচে তাদের অবস্থান।"

আরব দুনিয়াতেও চিত্রটা প্রায় একই। সেখানে লোকেরা অতটা দরিদ্র না হলেও শিক্ষাদীক্ষা ও সৃষ্টিশীলতার ক্ষেত্রে সমান অনগ্রসর। 'আরব লিগ' - এর সদস্য ২২টি দেশকে একত্রে আরব দুনিয়া বলা হয়ে থাকে এবং এদের প্রায় সকলেই তেল অথবা গ্যাসের মত প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ। তবুও তারা কেন অনগ্রসর?

এই প্রশ্নের একটি সদুত্তরের আশায় রাষ্ট্রসঙ্ঘের শাখা সংস্থা 'ইউনাইটেড নেশনস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম' বা 'ইউ এন ডি পি' গত ২০০১ সালে একটি কমিটি গঠন করে। আরব জগতেরর গণ্যমান্য পণ্ডিত ও বুদ্ধিজীবীরা ছিলেন কমিটির সদস্য। এক বছর অনুসন্ধান চালাবার পর গত জুলাই মাসে কমিটি তার রিপোর্ট, 'আরব হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট ২০০২', পেশ করে। কমিটির আহ্বায়ক, মিশরীয় পণ্ডিত জনাব নাদের ফেরগণি ও তাঁর সহকর্মীরা আরব দুনিয়ার ইতিবাচক ও নেতিবাচক, দুটি দিকই তাঁদের রিপোর্টে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তবে দুঃখের বিষয় হল, ইতিবাচক অংশ খুবই নগণ্য।

কোন দেশের অগ্রগতি বিচার করতে রাষ্ট্রসঙ্ঘ 'হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইনডেক্স' নামে একটি সূচক ব্যবহার করে। সংক্ষেপে যাকে বলা হয় 'এইচ ডি আই'। ইদানীং রাষ্ট্রসঙ্ঘ 'অলটারনেটিভ এইচ ডি আই' বা 'এ এইচ ডি আই' নামে আরও একটি সূচক ব্যবহার করতে শুরু করেছে। দেশের মানুষের গড়

আয়ু, শিশুমৃত্যুর হার, শিক্ষিতের হার, স্কুলে ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতির হার এবং মাথাপিছু গড় আয়ের ওপর ভিত্তি করে 'এইচ ডি আই' সূচক নির্ণয় করা হয়। 'এইচ ডি আই' থেকে মাথা পিছু আয় বাদ দিয়ে এবং অন্য কয়েকটি বিষয়, যেমন বাক্ স্বাধীনতা, অন্যান্য মৌলিক স্বাধীনতা, ইন্টারনেট -এর ব্যবহার ইত্যাদি যোগ করে 'এ এইচ ডি আই'-এর সূচক নির্ণয় করা হয়। এই দুই সূচকের নিরীখেই দেখা যায় যে, আরব দুনিয়ার অবস্থান সকলের নীচে (সারণী-১)।

আরব দুনিয়ার লোকসংখ্যা ২৮ কোটি, যা আমেরিকার লোকসংখ্যা ২৪ কোটির প্রায় সমান। কিন্তু 'বাৎসরিক গড় উৎপাদন' বা 'জি ডি পি' মাত্র ৫৩১০০ কোটি ডলার, যা স্পেনের 'জি ডি পি' থেকেও কম। পৃথিবীতে যে সব লোকেরা দিনে এক ডলার বা তার কম আয় করে, রাষ্ট্রসঙ্ঘের বিচারে তারা খুবই গরিব। কিন্তু আরবের গরিব লোকেরাও দিনে প্রায় ২ ডলার রোজগার করে। তাই তাদের তেমন গরিব বলা চলে না। কিন্তু সমস্যা রয়েছে অন্য জায়গায়। বিগত ২০ বছরে আরবদের আয় বেড়েছে বছরে ০.৫ শতাংশ হারে। তাই অবস্থার পরিবর্তন না হলে একজন আরবের আয় দ্বিগুণ হতে সময় লাগবে ১৪০ বছর। অথচ অনেক উন্নয়নশীল দেশ ১০ বছরে এই লক্ষ্য পূরণ করে ফেলছে।

আরব দুনিয়ার আর একটি প্রতিবন্ধকতা হল ক্রমবর্দ্ধমান বেকারী। বর্তমানে ১ কোটি ২০ লক্ষ, বা জনসংখ্যার ১৫ শতাংশ আরব বেকার। বিশেষজ্ঞদের অনুমান , ২০২০ সালের মধ্যে লোকসংখ্যা ৪০ কোটি হবে এবং তখন আড়াই কোটি লোক বেকার হবে। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় হল, এই সব আর্থিক কারণকে আরব দুনিয়ার অনগ্রসরতার মূল কারণ বলে রিপোর্টে বলা হয়নি। পক্ষান্তরে তিনটি সামাজিক কারণকেই এর জন্য দায়ী বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এগুলো হল, (১) ব্যক্তি স্বাধীনতা ও বৌদ্ধিক স্বাধীনতার অভাব, (২) জ্ঞান ও মুক্তচিন্তার অভাব এবং (৩) নারীজাতির চূড়ান্ত অবহেলা।

এর মধ্যে আবার ব্যক্তি স্বাধীনতার অভাবকেই চূড়ান্তভাবে দায়ী করে রিপোর্টে বলা হয়েছে, ''ব্যক্তিস্বাধীনতার অভাবই স্বেচ্ছাচারী, অগণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা, গোঁড়া পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা ও পরমত অসহিষ্ণু ধর্মীয় ব্যবস্থাকে টিকে থাকতে সাহায্য করছে এবং সমস্ত আরব জগতে এক শ্বাসরোধকর পরিবেশের সৃষ্টি করছে।'' রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে যে, শ্বাসরোধকর এই পরিবেশই

আরব জগতের সমস্ত সম্ভবনাকে অবদমিত ও ধ্বংস করে চলেছে। কোথাও কোথাও সামান্য গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা দেওয়া হচ্ছে বটে, তবে তা অনুকম্পা হিসাবে, নাগরিক অধিকার হিসাবে নয়। এই সব কারণে বিগত ৫০ বছরে সারা বিশ্বে উন্নয়ন ও প্রগতির যে জোয়ার বয়ে গিয়েছে, তা আরব দুনিয়াকে স্পর্শ করতে পারেনি। (সারণি-২ দ্রষ্টব্য)।

শিক্ষার ব্যাপারে রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, গত ২০ বছরে স্বাক্ষরতার হার বাড়লেও বর্তমানে প্রায় ৫০ শতাংশ মহিলা নিরক্ষর। তা ছাড়া শিক্ষার মানও অতি নিম্ন। তার থেকেও বড় কথা হল, এই শিক্ষা বৌদ্ধিক স্থবিরত্ব দূর করতে বা সৃষ্টিশীলতার প্রসার ঘটাতে একেবারেই অক্ষম। কারণ এই **"শিক্ষার মূল কথাই হল, একমাত্র কোরাণ ও হাদিসের মধ্যেই সত্য আছে। শিক্ষার উদ্দেশ্য হল, কোরাণ-হাদিসের জ্ঞানকে ব্যাখ্যা করা ও প্রচার করা। তাকে বিচার করা বা প্রশ্ন করা নয়।"**

আরব তথা মুসলীম দুনিয়ার আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, এই সমাজে মেয়েরা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। আর্থিক, সামাজিক বা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের কোন অবদান নেই বললেই চলে। এরা হল পুরুষের লালসা চরিতার্থ করার ও শিশুর জন্ম দেবার যন্ত্রবিশেষ। এখানে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক প্রেম-ভালবাসার সর্ম্পক নয়, এ হল ক্রীতদাসী ও তার মনিবের সম্পর্ক। তাই পুরুষ ইচ্ছামত তিন চারটি স্ত্রী নামক ক্রীতদাসী পুষতে পারে এবং যে কোন সময় তিনবার 'তালাক' বলে ঘর থেকে তাড়িয়েও দিতে পারে। তাই রিপোর্টে বলা হয়েছে, "যে সমাজ তার অর্ধেক সৃজন ক্ষমতাকে শ্বাসরুদ্ধ (stifle) করে রাখে, সে সমাজের উন্নতি হবে কেমন করে?"

যে কেউ ইসলামী শাস্ত্র কিছুটা অধ্যয়ন করলেই দেখতে পাবেন যে, মেয়েদের স্বাধীনতা দেবার ব্যাপারে আল্লা খুবই অনিচ্ছুক। পক্ষান্তরে তিনি তাদের নষ্ট প্রকৃতির মানুষ বলে নিন্দা করেছেন এবং শেষ বিচারের দিন তাদের নরকের আগুনে নিক্ষেপ করবেন বলে ঘোষণা করেছেন। আল্লা মুসলমান পুরুষদের আদেশ দিয়েছেন তাদের পর্দা দিয়ে আবৃত করতে এবং ঘরে অন্তরীণ করে রাখতে। অবাধ্য স্ত্রীদের বাগে আনতে আল্লা পুরুষদের আদেশ দিয়েছেন তাদের শয্যা ত্যাগ করতে ও লাঠি দিয়ে পেটাতে। তাতে ও কাজ না হলে তিনি তাদের ঘরে বন্দী করে

অন্নজল না দিয়ে মেরে ফেলার সুপারিশ করেছেন। আল্লার দৃষ্টিতে পুরুষ নারীর থেকে শ্রেষ্ঠ, কারণ নারীর ভরণপোষণের জন্য পুরুষ টাকা খরচ করে। আরও বিশদ আলোচনার জন্য উৎসাহী পাঠক বর্তমান লেখকের "ইসলামী ধর্মতত্ত্ব : এবার ঘরে ফেরার পালা" গ্রন্থের "ইসলামে নারীর স্থান ও পর্দাপ্রথা" অধ্যায় দেখতে পারেন।

বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, আল্লার এই সব নির্দেশকে অনুসরণ করেই আফগানিস্তানের তালিবানরা মেয়েদের জন্য হিজাব বা বোরখা ব্যবহার করা এবং ঘরে অন্তরীণ থাকাকে বাধ্যতামূলক করেছিল। মেয়েদের সব স্কুল-কলেজ বন্ধ করে দিয়েছিল। এবং আলজিরিয়ার কট্টরবাদীরা ৩০০ স্কুল-ছাত্রীর গলা কেটে দিয়েছিল, কারণ তারা স্কুলে গিয়েছিল। মিশরে ১৩ বছরের এক স্কুল-ছাত্রীকে নানাভাবে যন্ত্রণা দিয়ে মেরে ফেলা হয়েছিল, কারণ গরমে টিকতে না পেরে সে রাস্তার লোকজনের সামনে মুখমন্ডল অনাবৃত করেছিল। এই কারণেই কোন মুসলমান দেশে মেয়েদের খেলাধূলা করার কোন অধিকার নেই। আগে বাংলাদেশের মেয়েদের খেলাধূলা করার অধিকার ছিল। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র ঘোষিত হবার পরে তাদের সে অধিকার হরণ করা হয়। উপরন্তু, শাড়ীর দৈর্ঘ ১ হাত বাড়িয়ে ১২ হাত করা হয়, যাতে তারা ভাল করে পর্দা করতে পারে।

মুসলমান সমাজে মেয়েদের আরও একটি চরম লাঞ্চনার বিষয় হল, মৌখিকভাবে ৩ বার 'তালাক' শব্দ উচ্চারণ করে যে কোন স্ত্রীকে যখন খুশী, কোন খোরপোষ ছাড়াই, তার সন্তান-সন্ততি সহ বিদায় করা যায়। এই দিক দিয়ে দেখতে গেলে, মুসলমান সমাজে নারীর স্থান গৃহপালিত পশুর থেকে বেশি নয়। অনেকের ধারণা আছে যে সৌদি আরব তেল বিক্রি করে অনেক টাকা আয় করে এবং সেই কারণে সেখানকার সবাই বড়লোক। কিন্তু সে ধারণা ঠিক নয়। সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াধ এবং বন্দর শহর জেদ্দাতে গেলে দেখা যাবে যে রাস্তাঘাটে অনেক শিশু ভিক্ষা করছে। আগে বলা হত যে, হজের সময় অন্যান্য গরিব দেশ থেকে যারা হজ করতে আসে, তাদের অনেকে চোরা গোপ্তা পথে থেকে যায় এবং তাদের ছেলে মেয়েরাই ভিক্ষা করে। কিন্তু একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, রিয়াধে যত শিশু ভিক্ষা করে তার ৬৯ শতাংশ হল সৌদি আরবের নাগরিক। সমীক্ষায় আরও দেখা গেছে যে, এই সব শিশু ভিখারীরা হল তালাক প্রাপ্তা মহিলাদের সন্তান। গৃহপালিত পশুর মতই

তাদের ঘর থেকে বিতাড়িতকরা হয়েছে। তাই শুধু প্রাণ রক্ষার তাগিদেই রাস্তায় নেমে তারা ভিক্ষা করতে বাধ্য হচ্ছে।

রাঁচী থেকে 'সেবা সুরভী' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। গত ২০০২ সালে 'নারী শক্তি ২০০২' নামে তার একটা বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়, যাতে আমাদের বর্তমান রাষ্ট্রপতি মাননীয় আভুল পাকির জয়নালাবেদিন আব্দুল কালাম মহাশয়ের একটি বাণী প্রকাশিত হয়। সেই বাণীতে তিনি লেখেন, "As we all know birds have two wings. Unless both the wings grow equally, the bird cannot fly. Similarly, the society has two wings-man and woman. Both have to be developed equally. Then the society will fly" অর্থাৎ "আমরা সবাই জানি যে, পাখিদের দুটো ডানা আছে। দুটো ডানা সমান শক্তিশালী না হলে পাখি উড়তে পারে না । সে রকম, সমাজেরও দুটো ডানা আছে—পুরুষ এবং নারী। উভয়েরই সমান শক্তিশালী হওয়া প্রয়োজন। তবেই সমাজ উড়তে পারবে।"

কিন্তু প্রশ্ন হল, মাননীয় রাষ্ট্রপতি মহাশয় যে সমাজের লোক, সেই সমাজেই মেয়েরা সর্বাপেক্ষা বেশি নির্যাতিত। অথচ তিনি এ ব্যাপারে একটি শব্দও উচ্চারণ করেছেন বলে শোনা যায়নি। আরও আশ্চর্যের ব্যাপার হল কিছু দিন আগে সর্বোচ্চ আদালতের বিচারপতিরা সারা দেশে এক এবং অভিন্ন দেওয়ানী বিধি চালু করার সুপারিশ করেন। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, সারা দেশে সব সমাজের জন্য অভিন্ন দেওয়ানী বিধি চালু হলে মুসলীম সমাজের মেয়েরা অনেক রকম নির্যাতনের হাত থেকেই রক্ষা পেয়ে যাবেন। কারণ মুসলমান পুরুষরা তখন বহু বিবাহ এবং তিনবার তালাক বলে বিবাহ বিচ্ছেদের সুযোগ পাবে না। খুব সম্ভবত এই কারণেই মুসলমান সমাজের হর্তাকর্তারা অভিন্ন দেওয়ানী বিধির প্রবল বিরোধিতা করে। **কিন্তু সেই বাদানুবাদের সময় মাননীয় রাষ্ট্রপতি মহাশয় টুশব্দ না করে আশ্চর্যজনকভাবে নীরব থাকেন। মুসলমান মেয়েরা ন্যায্য নাগরিক অধিকার পাক, তা যদি তিনি মনে প্রাণে চাইতেন, তবে তাঁর পক্ষে নীরবে থাকা হয়তো সম্ভব হত না। উপরন্তু, নীরব থেকে প্রকারান্তরে মোল্লা-মৌলভীদের মতকেই তিনি পরোক্ষভাবে সমর্থন করেছেন।**

বাদশা আকবর নিরক্ষর ছিলেন। তাই তাঁর পক্ষে বিভিন্ন ধর্মের গ্রন্থ পড়া

সম্ভব ছিল না। কিন্তু সব ধর্মের পণ্ডিতদের ডেকে তিনি তাঁদের ধর্মের মূল বিষয়গুলো শুনেছিলেন। সব শুনে তিনি যখন বুঝতে পারলেন যে,ইসলামের মত জঘন্য কোন তত্ত্ব হতে পারে না, সেই মুহূর্তেই তিনি ঘৃণাভরে ইসলাম ত্যাগ করেছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি গোহত্যা নিষিদ্ধ করেছিলেন, কোন মুসলমানের পক্ষে মহম্মদ নাম রাখা অবৈধ ঘোষণা করেছিলেন এবং কামান দেগে অনেক মসজিদ ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। শাস্ত্র অনুসারে এই পার্থিব জীবনে মুসলমানদের সিল্কের কাপড় পরা ও সোনার গহনা ব্যবহার করা নিষিদ্ধ । এই নিয়মের বিরোধিতা করতে তিনি তাঁর সভাসদদের জন্য সোনার অলঙ্কার ও সিল্কের জামা পরা বাধ্যতা মূলক করেছিলেন। সমস্ত মসজিদে তিনি শূয়োরের চাষ করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন (Akbar The Great Mogul, V.A.Smith ch. on. Din-i-Ilahi)। আমাদের বর্তমান রাষ্ট্রপতি মহাশয় নিরক্ষর নন। অনেকের মতে, তিনি নাকি নিত্য গীতা পাঠ করেন। কাজেই গীতা ও কোরান এর মধ্যে কি তফাৎ, তা তাঁর অজানা থাকার কথা নয়। কাজেই আমরা আশা করব যে, **তিনি কোন্ ধর্ম মানবিক এবং কোন্ ধর্ম অমানবিক, সেই ব্যাপারে তাঁর মতামত জনসাধারণের কাছে সাহসের সঙ্গে ব্যক্ত করবেন এবং এই সব বিষয়ে তিনি বাদশা আকবরের মতই সাহসিকতার পরিচয় দেবেন। কারণ বাদশা আকবরের মত তিনিও আজ ভারতের রাষ্ট্রপ্রধান।**

এ ব্যাপারে আরও একটা কথা বলার আছে। আজকের দেশভাগ সহ হিন্দু ও মুসলীম সম্প্রদায়ের মধ্যে যে তিক্ততা ও শত্রুতা জন্ম নিয়েছে, তার মূল কারণ হল ভারতকে ইসলামীকরণের প্রচেষ্টা। বিদেশী মুসলমান শাসকরা এ দেশের হিন্দুদের ধর্মপরিবর্তন করে এ সমস্যার জন্ম দিয়েছে। বর্তমানে হিন্দু-মুসলমানের এই শত্রুতা পারমানবিক যুদ্ধের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করেছে। এই ভয়ঙ্কর ও করুণ ভ্রাতৃবিবাদকে মাত্র একটি উপায়ই এড়ানো সম্ভব, আর তা হল বিদেশী আরবী সংস্কৃতিকে বর্জন করে ভারতের সব মুসলমানের নিজস্ব বৈদিক ধর্ম ও সংস্কৃতিতে ফিরে আসা। এতে সকলেরই মঙ্গল। হিন্দুর মঙ্গল, মুসলমানের মঙ্গল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র দেশেরও মঙ্গল। তাই আমাদের রাষ্ট্রপতি মহাশয়ের উচিত বাদশা আকবরের মতই প্রথমে ইসলাম ত্যাগ করা এবং অতঃপর হিন্দু ধর্মে ফিরে এসে দেশের সমস্ত মুসলমানকে সঠিক পথ নির্দেশ করা। রাষ্ট্রপতি মহাশয়কে অনুরোধ, তিনি যেন বিষয়টা একটু ভেবে দেখেন।

যাই হোক, জনাব ক্লবিস মাকসুদ হলেন মিশরের একজন পণ্ডিত ব্যক্তি এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘের উপরিউক্ত রিপোর্টের এক জন অন্যতম প্রণেতা। সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল, মুসলীম সমাজের সার্বিক অনগ্রসরতার জন্য তিনি সরাসরি ইসলামের দিকেই আঙ্গুল তুলেছেন। এবং প্রকারান্তরে তিনি এটাই বলতে চেয়েছেন যে, **মুসলীম সমাজের অনগ্রসরতার জন্য মূলত দায়ি হল ইসলাম।** এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে এক জন বৃটিশ সাংবাদিক বলেন, "সব থেকে স্পর্শকাতর বিষয়, যা রিপোর্টের প্রণেতারা সযত্নে এড়িয়ে যেতে চেয়েছেন, তা হল, মুসলীম সমাজের অনগ্রসরতার ব্যাপারে ইসলামের ভূমিকা।"

আগেই বলা হয়েছে যে, স্কুল থেকেই মুসলমান শিশুদের শেখানো হয় যে, এক মাত্র কোরাণ ও হাদিসেই সত্য আছে। তাই নিজস্ব যুক্তি বুদ্ধি দিয়ে সত্যের অনুসন্ধান করার কোন প্রয়োজন নেই। সুতরাং বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, মুসলীম সমাজে যুক্তি বিচারের কোন স্থান নেই। শিশু বয়স থেকেই তাদের বোঝানো হয় যে, আল্লাতায়লা কোরাণ ও হাদিসের মধ্যে দিয়ে যে সত্য প্রকাশ করেছেন, তাকে সর্বোচ্চ মান্যতা দিতে হবে বা তাকে অমান্য করার সাধ্য কারোরই নেই। শিক্ষার উদ্দেশ্য হল, কোরাণ-হাদিসের সেই সত্যকে ব্যাখ্যা করা। তার প্রচার করা। সেই সত্যকে সন্দেহ করা বা তাকে প্রশ্ন করা নয়। কোরাণকে প্রশ্ন করার অর্থ আল্লার প্রতি সন্দেহ করা, তাই তা মহাপাপ।

তাই কোরাণে যা কিছু আছে তাকে অভ্রান্ত বলে মেনে নিতে হবে। শিক্ষিত বা অশিক্ষিত, সব মুসলমানকেই বিশ্বাস করতে হবে যে, ৬২১ খ্রীষ্টাব্দের রজব মাসের ২৭ তারিখে নবী মহম্মদ পার্থিব কয়েক ঘন্টার মধ্যে, সজ্ঞানে ও সশরীরে স্বর্গভ্রমণ (মেরাজ) করেছিলেন। বিশ্বাস করতে হবে যে তিনি চাঁদকে ভেঙ্গে দু টুকরো করেছিলেন। বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লা মাত্র ৬ দিনের মধ্যে, শূণ্য থেকে এই আকাশ-পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। বিশ্বাস করতে হবে যে, আকাশ একটা কঠিন ছাদ, যা আল্লা তাঁর বিশেষ কুদরতের দ্বারা কোন স্তম্ভ ছাড়াই স্থাপন করে রেখেছেন এবং কেয়ামত বা শেষ বিচারের দিন আল্লা ওই কঠিন ছাদকে ভেঙ্গে ফেলবেন এবং তা গুড়ো গুড়ো হয়ে পৃথিবীতে পড়বে।

তাকে আরও বিশ্বাস করতে হবে যে, এই মনুষ্য জাতি এক জোড়া নরনারী, আদম ও হাওয়া থেকে যাত্রা শুরু করেছে এবং নবী মহম্মদ ছিলেন হজরৎ আদমের ৯০ তম বংশধর। এবং এর মধ্যে দিয়ে তাকে স্বীকার করে নিতে হবে

যে, মাত্র ৪১৩৩ বছর আগে আল্লাতায়লা এই পার্থিব জগত সৃষ্টি করেছেন। কারণ দুই পুরুষের মধ্যে ৩০ বছর বয়সের ব্যবধান ধরে নিলে এই হিসাবই পাওয়া যায়। আমাদের মাননীয় রাষ্ট্রপতি মহাশয় যতবড় বিজ্ঞানীই হোন না কেন, তাঁকেও কোরাণের এই সব বিষয়ে বিশ্বাস করতে হবে। অন্যথায় তাঁর গর্দানের বিপদ দেখা দেবে।

সেই সঙ্গে সঙ্গে কোন মুসলমানেরই অধিকার নেই নবী মহম্মদের জীবন ও তাঁর কাজকর্মকে যুক্তি দিয়ে বিচার করার। শুধু তাঁর প্রশংসাই করতে হবে। তিনি যে কুরাইজা ও নাজির গোত্রের ইহুদীদের গণহত্যা করেছিলেন এবং ১০ বছর মদিনা বাসকালে ৮২টা আক্রমণ ও অভিযান চালিয়ে আরবের অমুসলমান কাফেরদের কচুকাটা করেছিলেন, সেইসব নৃশংস কাজ গোপন করতে হবে। সব সময় তাঁকে দেখাতে হবে শান্তির দূত ও ক্ষমার অবতার হিসাবে। শেষ বয়সে নবী যে একের পর এক নিকা করে মোট ১২জন পত্নীর স্বামী হয়েছিলেন, সেই সব বিয়ে শাদীর মধ্যে শুধু পবিত্রতা খুঁজতে হবে। এমন কি, তাঁর ৫২ বছর বয়সে ৬ বছরের শিশু আয়েশাকে নিকা করা এবং ৫৪ বছর বয়সে পালিত পুত্র যায়েদ-এর স্ত্রী জয়নবকে নিকা করার মধ্যেও পবিত্রতা আবিষ্কার করতে হবে। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি ও বিচার শক্তির কি চরম অপমান! কি কল্পনাতীত বৌদ্ধিক দাসত্ব!

কাজেই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, মুসলীম সমাজ হল শৃঙ্খলিত এক ক্রীতদাসের সমাজ। এক বৌদ্ধিক দাসত্ববৃত্তির সমাজ। সেই সমাজে চিন্তার কোন স্বাধীনতা নেই এবং মুক্ত চিন্তার কোন সুযোগ নেই। ক্রীতদাসের মত শুধু নিয়ম পালন করে যাও। নবী বলেছেন যে গোঁফকেটে দাড়ি রাখ, কারণ তা হলে মুসলমাদের চিনতে সুবিধা হবে। তাই কোন প্রশ্ন না করে গোঁফ কামিয়ে দাড়ি রাখতে হবে। খাওয়ার পর নবী হাত চেটে পরিষ্কার করতেন, তাই সব মুসলমানকে হাত চেটে পরিষ্কার করতে হবে। পাজামার ঝুল গোড়ালী ঢেকে ফেললে নবী তাকে অহমিকার প্রকাশ বলে মনে করতেন। তাই খাটো ঝুলের পাজামা পরতে হবে। নবী কুকুর পছন্দ করতেন না, তাই কুকুর পোষা যাবে না। কম জল ব্যবহার করে নবী যেভাবে অজু কবতেন, জলের দেশ এই বাংলায়ও ওই একইভাবে অজু করতে হবে। কোরাণে আল্লাতায়লা কোথাও বলেননি যে, হে মুসলমানগণ, তোমরা লেখাপড়া শিখে নিজেদের উন্নত কর, মানুষ হও।

তাই লেখাপড়া বর্জন করে মূর্খ হয়েই থাকতে হবে। আল্লা বলেছেন যে, শুধুমাত্র 'লা ইলাহা ইল্লাল্লা' কলেমা গ্রহণ করার জন্য তিনি কেয়ামতের দিন মুসলমানদের সব গোনাহ্ (পাপ) মাফ করে দেবেন, তাই যত খুশী অপরাধ করতে থাক, দুনিয়ার যত দুষ্কর্ম সব করতে থাকো।

কাজেই বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, বৌদ্ধিক দিক দিয়ে অবরুদ্ধ এরকম একটি ক্রীতদাসের সমাজ সভ্যতার পথে অগ্রসর হবে কেমন করে ? তাই এই ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে একজন বৃটিশ সাংবাদিক বলেন, "বুদ্ধি ও চিন্তার এই চরম দাসত্ববৃত্তিই মুসলীম সমাজের অগ্রগতির পথে প্রধান অন্তরায়।" উপরন্তু, কোরাণে আল্লাতায়লার বাণী সমূহ পাঠ করলে এটাই পরিষ্কার হয় যে, আল্লা তাঁর বান্দাদের মানুষ হবার সমস্ত রাস্তা বন্ধ করে শুধু মুসলমান করে রাখারই পক্ষপাতী।

সারণী-১

অঞ্চল	এইচ ডি আই	এ এইচ ডি আই
উত্তর আমেরিকা	০৪	১০
ইয়োরোপ	২০	১৯
অস্ট্রেলিয়া	২১	২০
ল্যাটিন আমেরিকা	৪৬	৪৮
দক্ষিণ এশিয়া	৬৮	৭০
আরব দুনিয়া	৭৫	৮৬

(সূত্র-Arab Human Development Report 2002)

সারণী-২

অঞ্চল	মৌলিক স্বাধীনতা
উত্তর আমেরিকা	১০০
অস্ট্রেলিয়া	৯৫
ইয়োরোপ	৮২
ল্যাটিন আমেরিকা	৬৫
দক্ষিণ এশিয়া	৪০
আরব দুনিয়া	১৬

(সূত্র-Arab Human Development Report 2002)

পরিশিষ্ট - ৩

হিন্দু-মুসলমান সমস্যা ঃ কিভাবে হবে সমাধান

১৯৪৭ সালে মাতৃভূমির অঙ্গচ্ছেদের মধ্যে দিয়ে দেশ স্বাধীন হল। দেশ মাতৃকার দেহকে তিন টুকরো করার ফলে হিন্দুর মন হল ভারাক্রান্ত। কিন্তু মুসলমানরা হল আনন্দে উদ্বেল। কারণ দেশমাতৃকার প্রতি তাদের শ্রদ্ধা, ভালোবাসা বা প্রেম নেই। **মুসলমান হবার সঙ্গে সঙ্গে আরব হয়েছে তাদের শ্রদ্ধার কেন্দ্র। আর মাতৃভূমি ভারত হয়েছে শত্রুর দেশ— দার-উল-হার্ব।** সেই শত্রুর দেশ থেকে খানিকটা খুবলে নিয়ে আল্লার দেশ পাকিস্তানে পরিণত করার চাইতে সুখের বিষয় আর কি হতে পারে।

এই দেশ ভাগ নিয়ে অনেক গবেষণা, বিচার বিশ্লেষণ হয়েছে। অনেকের মতে, দেশ ভাগের জন্য দায়ী হল সাম্রজ্যবাদী বৃটিশ শক্তি। অন্য অনেকে এ জন্য তৎকালীন কংগ্রেস নেতাদের দায়ী করে থাকেন এবং বলেন, ক্ষমতার লোভে তাঁরা তড়িঘড়ি দেশ ভাগ মেনে নিয়েছিলেন। সুতরাং দেশ ভাগের জন্য কে দায়ী, এই প্রশ্নে দেশের মানুষের মনের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। কিন্তু একটু গভীর ভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, দেশ ভাগের জন্য মূলত দায়ী হল আরবে উদ্ভুত একটি বর্বর তত্ত্ব, যার নাম ইসলাম। এ ব্যাপারে জিন্নাই ঠিক কথা বলেছিল। তার মতে যে দিন প্রথম একজন হিন্দু ভারতবাসী ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়েছিল সেই দিনই ভারতের মাটিতে পাকিস্তানের বীজ রোপিত হয়েছিল। আরবের রক্তসিক্ত গ্রন্থ কোরাণই সেই বর্বর তত্ত্বের বাহক, যা এই ভারতের হিন্দু ও বৌদ্ধদের ধর্মান্তরিত করে রক্তক্ষয়ী এক ভ্রাতৃবিবাদের সূত্রপাত করেছে। যার অন্তিম পরিণতি হল দেশ জননীর অঙ্গচ্ছেদ। বিবাদ আজও বিদ্যমান রয়েছে। কারণ মুসলমানদের উদ্দেশ্য হল সমস্ত ভারতকে আল্লার দার-উল-ইসলাম-এ পরিণত করা। জাতীয়তাবাদী মুসলমান বলে খ্যাত মৌলানা আবুল কালাম আজাদও এই ইসলামী ধ্যান ধারণার বাইরে ছিলেন না। তাই তিনি বলেছিলেন, 'ভারতের মতো একটি দেশ, যা এককালে মুসলমান রাজত্বের অধীন ছিল, তাকে আবার জয় করে ইসলামী দেশ বানাতে হবে''। ভারতকে জয় করে দার-উল-ইসলাম বানানোর জন্যই যে পাকিস্তান পারমাণবিক অস্ত্র ও দূরপাল্লার

ক্ষেপণাস্ত্র মজুদ করছে তা বলাই বাহুল্য।

গত ১৯৯৮ সালের ৩০ নভেম্বর 'টাইম' পত্রিকায় ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জর্জ ফার্নাণ্ডেজ ও পাকিস্তানী পরমাণু বিজ্ঞানী আব্দুল কাদের খানের সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়, যাতে উপরিউক্ত মুসলিম মানসিকতা সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে। ভারত ও পাকিস্তানের জনসাধারণের ব্যাপারে প্রশ্ন করলে শ্রীফার্নাণ্ডেজ বলেন, "একজন পাকিস্তানীর মধ্যে আমি আমাদেরই রক্ত মাংস দেখতে পাই। আমরা পৃথক দুটি রাষ্ট্র বটে। কিন্তু মানুষ সব এক।" ওই একই প্রশ্ন আব্দুল কাদের খানকে করলে তিনি বলেন, "কোনও কোনও ব্যাপারে মিল থাকলেও মূলত আমরা ওদের থেকে আলাদা। আমরা মুসলমান, ওরা হিন্দু। আমরা গরু খাই, ওরা গরুকে পূজো করে। আমরা এক দেশে বাস করতাম, এক ভাষায় কথা বলতাম, তাতে প্রমাণ হয় না আমরা অভিন্ন।"

উপরিউক্ত দুই মন্তব্যের মধ্যেকার প্রভেদ বিশেষ ভাবে লক্ষ্যণীয়। প্রথমোক্ত মন্তব্য ঐক্যবন্ধনে বাঁধার প্রেরণা যোগায়। কিন্তু দ্বিতীয় মন্তব্য ঐক্যবন্ধনের সমস্ত সূত্রকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করার কাজে উৎসাহ যোগায়। এটাই হল বিচ্ছিন্নতাবাদী মুসলমান মানসিকতা। আরবের বর্বর গ্রন্থ ও পশুপালক বর্বর আরব্য সংস্কৃতির প্রভাবেই যে আমাদের কিছু দেশবাসী ভাইয়ের মনে এই বিচ্ছিন্নতাবাদী মানসিকতার সৃষ্টি হয়েছে তা বলাই বাহুল্য। আরবের সেই বর্বর গ্রন্থ গীতা, গঙ্গা, গায়ত্রী ও গোবিন্দে অনুরক্ত ভারতের কিছু মানুষকে আরবের বর্বর দেবতার প্রতি অনুরক্ত করে তুলেছে এবং সেই বর্বর দেবতার নির্দেশে তারা ভাইয়ের বুকে ছুরি বসাচ্ছে। মা বোনকে অত্যাচার করছে, দেশ মাতৃকাকে খণ্ড খণ্ড করছে এবং জন্মভূমিকে জয় করার পরিকল্পনা করছে। তার চেয়েও বড় কথা হল, আরবের বর্বর রক্তপিপাসু গ্রন্থ ভাইয়ের মনকে ভাইয়ের প্রতি এতখানি বিষাক্ত করে তুলেছে যে, সেই বিদ্বেষ ও ঘৃণা আজ পারমাণবিক যুদ্ধের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এর ফলাফল হবে মারাত্মক এবং এর দ্বারা হিন্দু বা মুসলমান, কারোই মঙ্গল হবে না।

কিন্তু সুখের কথা হল, বর্তমানে কিছু কিছু মুসলমান বুদ্ধিজীবী ইসলামের মধ্যে দিয়ে আরবের পশুপালক বর্বর সংস্কৃতিকে অনুসরণ করার বিপদ বুঝতে পারছেন। এই বিষয়ে সবাইকে সচেতন করার চেষ্টা চালাচ্ছেন। তারা বুঝতে

পারছেন যে, বর্বর আরবা সংস্কৃতিকে অনুসরণ করার ফলে মুসলমানরা সভ্যতার পথে ক্রমাগত পিছিয়ে পড়ছে। এটা শুধু বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মুসলমানদের ব্যাপারে নয়, বিশ্বের সমগ্র মুসলীম সমাজই শিক্ষা-দীক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্পকলা সাহিত্য ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ছে। শুধু তাই নয়, একবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান প্রযুক্তিকে সেই পিছিয়ে পড়া মূর্খের দল চোদ্দশ বছরের পুরানো এক বর্বর তত্ত্বের দ্বারা পরাজিত করার হাস্যকর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। শ্রীজাফর আদম হলেন শুভবুদ্ধি সম্পন্ন একজন পাকিস্তানী সাংবাদিক। এই সব ব্যাপারে , বিশেষ করে দেশ ভাগের বেদনা থেকে তিনি লিখছেন 'যদি ৫০ বছর সময়ের মধ্যেও পাকিস্তানকে বিশুদ্ধ ইসলাম প্রতিষ্ঠার উপযোগী করে তোলা না যায় তবে তা (অর্থাৎ পাকিস্তান) সৃষ্টি করারই বা কি প্রয়োজন ছিল?" তিনি আরও লিখেছেন, "যদি বিশুদ্ধ ইসলামী ব্যবস্থার প্রবর্তন না-ই করা যায়, তবে কেন আমরা পূর্বের অখণ্ড ভারতে ফিরে যাবো না? আজও সীমান্তের ওপার থেকে ভেসে আসছে হৃদয় উদ্বেল করা, অন্তরাত্মার শিহরণ জাগানো ঐক্য বন্ধনের উদাত্ত আহ্বান।

শ্রীজাফর আদম আরও লিখছেন যে, জিন্নার সিগারেটের ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে সৃষ্টি হয়েছিল পাকিস্তান। তাই সেখানে উত্তাপ (অর্থাৎ হানাহানি মারামারি) লেগেই আছে। "মহান দেশ সেই ভারতবর্ষ হল ঈশ্বরের এক আশীর্বাদ। সেই দেশ স্বভাবতই উর্বর ও সৃষ্টিশীল। সেই দেশের কোলে বহু ধর্ম ও মতবাদ এক সঙ্গে অবস্থান করছে। সেই দেশে বহুরকম বিরোধের মধ্যে বিরাজ করছে এক মহান ঐক্য, যা আমাদের এই মুমালকৎ-ই-খুদাদ্-এ অনুপস্থিত।"

কাজেই বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় যে, শ্রীজাফর আদম যে অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন দেখছেন, সেই স্বপ্নই দেখেছেন ঋষি অরবিন্দ, পরমপূজ্য ডাক্তারজী ও পূজনীয় গুরুজী। সেই অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠার মধ্যেই নিহিত রয়েছে এই দেশের হিন্দুর মঙ্গল এবং মুসলমানের মঙ্গল। কিন্তু কেমন করে প্রতিষ্ঠিত হবে সকলের পক্ষে কল্যাণকারী সেই অখণ্ড ভারত? **প্রথমেই দূর করতে হবে, বর্জন করতে হবে ভাইয়ে ভাইয়ে বিদ্বেষ ও ঘৃণা সৃষ্টিকারী আরবের তত্ত্ব ও গ্রন্থ। সমগ্র বিশ্বের কল্যাণকারী যে বৈদিক সংস্কৃতি, যেই সংস্কৃতি, হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে, এই দেশের প্রতিটি মানুষের মাতৃস্বরূপা, এই মায়ের কাছেই**

আত্মসমর্পণ করতে হবে সবাইকে। আরবের বর্বর দেবতাকে পরিত্যাগ করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে আশ্রয় নিতে হবে আজকের বিকৃত মস্তিষ্ক, সকল মুসলমান ভাইকে। আরবের পশুপালক বর্বর সংস্কৃতিকে ত্যাগ করে তাদের ফিরে আসতে হবে জননী স্বরূপা গঙ্গা, গীতা, গায়ত্রী ও গোবিন্দের সংস্কৃতিতে। এটাই একমাত্র পথ। এ পথেই হবে ভাইয়ে ভাইয়ে পুনর্মিলন, স্থাপিত হবে গরিমাময় অখণ্ড ভারত। সমস্ত মহাপুরুষের স্বপ্নের সেই অখণ্ড ভারত। মুসলমান সাংবাদিক জাফর আদমের স্বপ্নের সেই অখণ্ড ভারত। চিরকালের মতো দূরীভূত হবে ভাইয়ে ভাইয়ে বিদ্বেষ ও অবিশ্বাস।

হিন্দুর শোক দিবস ১৫ই আগস্ট

আবার এসে গেল ১৫ই আগস্ট, ইংরাজ পরাধীনতা থেকে মুক্তি পাবার দিন। ১৫ আগস্ট তাই খুশির দিন। সরকারি ছুটির দিন। কিন্তু হিন্দুর কাছে ১৫ আগস্ট কি শুধু আনন্দ উৎসব করার দিন, না ওই দিনটি শোকের দিন এবং কাঁদবার দিনও বটে। কারণ ওই দিন দেশমাতৃকাকে কেটে তিন টুকরো করা হয়েছিল। খণ্ডিত মায়ের রক্তাক্ত শরীরের ওপর দিয়ে এসেছিল স্বাধীনতা। কোটি কোটি হিন্দু ভিটেমাটি ও সর্বস্ব খুইয়ে প্রাণের ভয়ে পালিয়ে এসেছিল নতুন ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তান থেকে। লক্ষ লক্ষ হিন্দু রমণীর কান্না ও আর্তনাদের মধ্যে দিয়ে জন্ম নিয়েছিল সেই পাকিস্তান। লক্ষ লক্ষ হিন্দুর রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল সেই পাকিস্তান। লক্ষ লক্ষ হিন্দুর রক্তে কর্দমাক্ত হয়েছিল পাকিস্তানের মাটি। তাই হিন্দুর কাছে ১৫ আগস্টের স্মৃতি মধুর স্মৃতি, সুখের স্মৃতি হতে পারে না। সেই স্মৃতি হল করুণ এক ভাগ্য বিপর্যয়ের স্মৃতি। যতদিন এই খণ্ডিত দেশ আবার জোড়া না লাগছে ততদিন কোটি কোটি হিন্দুর জন্মস্থান হয়ে থাকবে বিদেশ। সেখানে যাবার তার অধিকার থাকবে না, এই বেদনার কথা ভুক্তভোগী ছাড়া আর কে বুঝবে?

কিন্তু কেন হয়েছিল এই দেশভাগ? কারা করেছিল এই দেশভাগ? কারা দেশ মাকে খন্ডিত করার দাবি করেছিল, আর কারা মেনে নিয়েছিল ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগের সেই অযৌক্তিক দাবি? ইতিহাসের পাতা থেকে উধাও করে দেওয়া হচ্ছে সেইসব চক্রান্ত, বিশ্বাসঘাতকতা ও হিন্দুর প্রতি চরম অবজ্ঞার সেই সব কাহিনী। মুছে দেওয়া হচ্ছে হিন্দুকে প্রতারিত করা, প্রবঞ্চনা করার সেইসব করুণ ইতিহাস। তাই হিন্দু আজ বিভ্রান্ত। এইসব প্রতারকদের, দেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতকদের শনাক্ত করতে সে ভ্রমসঙ্কুল। কারও মতে, দেশভাগ বৃটিশ চক্রান্তের ফল। কারও মতে, দেশ ভাগের জন্য দায়ী হল কংগ্রেস নেতাদের বিশ্বাসঘাতকতা। আজও হিন্দু আঙুল তুলে সমস্বরে বলছে না যে, দেশ ভাগের জন্য মূলতঃ দায়ী হল আরবের এক বর্বর তত্ত্ব, যার নাম ইসলাম এবং আরবের এক বর্বর গ্রন্থ, যার নাম কোরান। দায়ী সেই গ্রন্থের প্রভাবে বিকৃত মস্তিষ্ক এই দেশেরই এক ধরনের মানুষ, যাদের নাম

মুসলমান।

আরও আশ্চর্যের ব্যাপার হল, আজও অনেক হিন্দু বিশ্বাস করে যে, মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী দেশভাগের বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু জওহরলাল নেহেরু ও কংগ্রেসের অন্যান্য নেতারা গান্ধীর মতকে উপেক্ষা করেই দেশভাগ মেনে নিয়েছিলেন। তাদের এই বিশ্বাস কতটা সত্য তা তলিয়ে দেখার প্রয়োজন আছে। তাদের এই বিশ্বাসের ভিত্তি হল, সেই সময় গান্ধী প্রকাশ্য সভায় বলতেন, "vivisect me before you vivisect India"—অর্থাৎ 'দেশকে খণ্ডিত করার আগে আমাকে খণ্ডিত কর।' আমাদের মধ্যে অনেকেরই জানা নেই যে, সভা সমিতিতে গান্ধী যখন এই কথা বলছিলেন, তখন তিনি তাঁর লেখার মধ্যে দিয়ে সম্পূর্ণ বিপরীত মত প্রকাশ করছিলেন।

এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে, ১৯৪০ সালের ২৬ মার্চ, লাহোর বৈঠকে মুসলিম লিগের নেতারা সর্বপ্রথম দেশভাগ ও পাকিস্তানের দাবি উত্থাপন করে। তাদের সেই দাবিকে সমর্থন করে গান্ধী দিন দশ পরে, ৬ এপ্রিলের 'হরিজন' পত্রিকায় লিখেছেন—"দেশের অন্যান্য জনগোষ্ঠীর মতো মুলসলমানদেরও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আছে। বর্তমানে আমরা একটা যৌথ পরিবারের মতই বসবাস করছি। তাই এর কোন এক শরিক ভিন্ন হতে চাইতেই পারে।" বছর দুই পরে, ১৯৪২ সালের ১৮ এপ্রিলের 'হরিজন' পত্রিকায় তিনি আবার লিখলেন—"যদি ভারতের বেশিরভাগ মুসলমান এই মত পোষণ করে যে মুসলমানরা একটা আলাদা জাতি, যাদের সঙ্গে হিন্দু বা অন্য জনগোষ্ঠীর কোন মিল নেই, তবে পৃথিবীতেএমন কোন শক্তি নেই যে সেই চিন্তা-ভাবনা থেকে তাদের বিরত করতে পারে। এবং সেই ভিত্তিতে তারা যদি দেশ বিভাগ চায় তবে অবশ্যই দেশভাগ করতে হবে। তবে ইচ্ছা করলে হিন্দুরা তার বিরোধিতা করতে পারে।"

পাঠকের হয়তো স্মরণ আছে যে, ১৯৪৭ সালে, স্বাধীনতার প্রাক্কালে যখন দেশ বিভাগের সমস্যা প্রধান সমস্যা হিসাবে দেখা দিল, তখন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি তার ১২ জুনের বৈঠকে স্থির করে যে, অখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটি ১৪ ও ১৫ জুনের অধিবেশনে দেশ বিভাগের প্রস্তাব উত্থাপন করা হবে। সেই অনুসারে ১৪ জুন নতুন দিল্লিতে অখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে দেশ বিভাগের প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। কংগ্রেসের অনেক বিশিষ্ট নেতা, যেমন

পুরুষোত্তমদাস ট্যান্ডন, গোবিন্দ বল্লভ পন্থ, চৈতরাম গিদোয়ানি, ডাঃ এস কিচলু প্রমুখেরা দেশ ভাগের প্রস্তাবের বিরোধিতা করে জোরালো বক্তব্য রাখেন। এই সময় গান্ধী সবাইকে থামিয়ে দেশ ভাগের স্বপক্ষে ৪৫ মিনিট ধরে তাঁর বক্তব্য পেশ করেন। তাঁর বক্তব্যের মূল বিষয় ছিল দুটি। প্রথমত, দেশভাগ মেনে না নিলে দেশব্যাপী অরাজকতা দেখা দেবে (অর্থাৎ মুসলমানরা অসন্তুষ্ট হবে এবং দেশব্যাপী দাঙ্গা শুরু করবে) এবং দ্বিতীয়ত, দেশের নেতৃত্ব কংগ্রেসের হাত থেকে অন্য কোন দলের বা ব্যক্তির (অর্থাৎ হিন্দুত্ববাদীদের হাতে) নেতৃত্বে চলে যাবে। বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় যে, তাঁর বক্তব্যের মূল সুর ছিল, দেশ বিভাগ মেনে নিয়ে মুসলমানদের খুশি করা। অন্যথায় দেশব্যাপী দাঙ্গা শুরু করতে মুসলমানদের প্ররোচিত করা।

যাই হোক, দেশ বিভাগের প্রশ্নে সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল ছিলেন তখনও দ্বিধাগ্রস্ত এবং গান্ধীর ৪৫ মিনিট ভাষণে তিনি এতটাই মোহিত হয়ে পড়লেন যে তখনই তিনি দেশ ভাগের একজন প্রবল সমর্থক হয়ে গেলেন। এবং তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে অন্যান্য দ্বিধাগ্রস্ত নেতারাও দেশ ভাগের পক্ষে রায় দিলেন। ফলে দেশ ভাগের প্রস্তাব গৃহীত হল।

অহিংসা ও সেকুলারবাদের আড়ালে গান্ধীর মুসলমান তোষণের নীতি শুধু দেশভাগ করে ক্ষান্ত থাকেনি। স্বাধীনতার পরেও তা হিন্দুর প্রভূত ক্ষতি সাধন করেছে এবং এখনও করছে। সেই সময় অবিভক্ত ভারতে মুসলমানের সংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার ২৩ শতাংশ এবং এই ২৩ শতাংশ মুসলমান দেশের ৩২ শতাংশ জমি পাকিস্তান হিসাবে পেয়ে যায়। কাজেই তখন সর্বাপেক্ষা যুক্তিযুক্ত পদক্ষেপ ছিল খণ্ডিত ভারতের সমস্ত মুসলমানকে পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেওয়া এবং পাকিস্তানের সমস্ত হিন্দুকে ভারতে নিয়ে আসা। কিন্তু গান্ধী এই জন-বিনিময়-এর প্রবল বিরোধিতা করে বলেন যে—"এটা এক অলীক ও অবাস্তব প্রস্তাব।" তৎকালীন বৃটিশ প্রতিনিধি লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনও এই জন-বিনিময়ের সমর্থক ছিলেন এবং প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুকে এই কাজ সমাধা করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু গান্ধীর প্রবল বিরোধিতার ফলে নেহরু কোন পদক্ষেপ নিতে পারেননি। অথচ বাস্তব দিক থেকে বিচার করলে সেই সময় জন-বিনিময় ছিল একান্ত জরুরি। দেশ বিভাগের প্রাক্কালে পশ্চিম পাঞ্জাবের মুসলমানরা দাঙ্গা শুরু

করলে হিন্দুরা উদ্বাস্তু হয়ে পূর্ব পাঞ্জাবে ও দিল্লিতে আসতে শুরু করে। তখন গান্ধী সেইসব বিপন্ন হিন্দুদের উদ্দেশ্য করে বললেন, "মুসলমানরা যদি হিন্দুদের অস্তিত্বকেও বিপন্ন করে তোলে, তবুও হিন্দুদের কখনোই উচিত হবে না মুসলমাদের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করা। যদি তারা আমাদের সবাইকে তরোয়াল দিয়ে কেটে ফেলে, তবে আমাদের উচিত হবে বীরের মতো সেই মৃত্যুকে বরণ করা। জন্ম-মৃত্যু অদৃষ্টের লিখন, তাই নিয়ে এত মন খারাপের কি আছে?" (৬.৪.১৯৪৭ তারিখে প্রদত্ত ভাষণ)।

এ ব্যাপারে তিনি আরও বললেন, "রাওয়ালপিণ্ডি থেকে যেসব লোকেরা পালিয়ে এসেছে, তাদের মধ্যে কিছু লোক আমার সঙ্গে দেখা করে বলল, যে সমস্ত লোক (হিন্দু) এখনও পাকিস্তানে পড়ে রয়েছে, তাদের কি হবে? আমি তাদের প্রশ্ন করলাম, তোমরা কেন এখানে (দিল্লিতে) চলে এসেছো? কেন তোমরা সেখানে মরে গেলে না? আমি এখনও বিশ্বাস করি আমরা যে যেখানে জন্মেছি এবং বসবাস করেছি, সে স্থান আমাদের কখনও ত্যাগ করা উচিত না, এমনকি সেখানকার লোকেদের কাছ থেকে নিষ্ঠুর ব্যবহার পেলে বা মৃত্যু নিশ্চিত হলেও না। যদি সেই লোকেরা তোমাদের হত্যা করে, তবে যাও, মুখে ভগবানের নাম নিতে নিতে তাদের হাতে বীরের মৃত্যু বরণ কর। যদি আমাদের লোকেদের (হিন্দুদের) হত্যা করা হয়, তবে কেন আমরা অন্য কারও (মুসলমানদের) ওপর ক্রুদ্ধ হব? যদি তাদের হত্যা করা হয় তবে তোমাদের বুঝে নিতে হবে যে, তারা আকাঙ্ক্ষিত উত্তম গতিই লাভ করেছে।" (২৩.৯.১৯৪৭ তারিখের ভাষণ)।

এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বললেন, "যাদের হত্যা করা হয়েছে, তারা যদি সাহসের সঙ্গে মৃত্যু বরণ করে থাকে, তবে তারা কিছুই হারায়নি, বরং কিছু অর্জন করেছে। মৃত্যুর জন্য আমাদের ভীত হওয়া উচিত নয়, প্রকৃতপক্ষে যারা হত্যা করছে তারা তো আমাদের ভাই ছাড়া আর কেউ নয়। তারা তো আমাদেরই মুসলমান ভাই।" (Gandhi and Godse, Koenraad Elst, Voice of India. P-121)। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে চলে আসা কয়েকজন হিন্দু গান্ধীর সঙ্গে দেখা করলে গান্ধী তাদের পাকিস্তানে ফিরে যেতে উপদেশ দেন এবং বলেন, "একটি মুসলমানকেও হত্যা না করে শেষ মানুষটি পর্যন্ত সকল পাঞ্জাবী (হিন্দু) যদি নিহত হয়, তবে পাঞ্জাব অমর হবে। তোমরা ফিরে যাও এবং অহিংসার

স্বার্থে স্বেচ্ছাকৃত বলি হও" (Freedom at Midnight; Collins and Lapierre, P-385)।

গান্ধী ও তাঁর মুসলমান তোষণকারী অহিংসার তত্ত্ব সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে ঋষি অরবিন্দ বলেন, India will be free to the extent it succeeds in shaking off the spell of Gandhism অর্থাৎ 'ভারতবর্ষ ততখানিই স্বাধীন হবে, গান্ধীবাদের যাদুমন্ত্রকে সে যতখানি ঝেড়ে ফেলতে পারবে' (Gandhi in Indian Politics, Ashutosh Lahiry, P-221)। তাই এই ১৫ আগস্টের দিনে সমস্ত হিন্দুকে সেই গান্ধীবাদের যাদুকে ঝেড়ে ফেলার সঙ্কল্প গ্রহণ করতে হবে এবং তা হলেই ভারতবর্ষ এক স্বাভিমানী ও বীর্যবান হিন্দুরাষ্ট্র হিসাবে জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করার পথে এগিয়ে যেতে পারবে।

পরিশিষ্ট - ৫

মুসলিম সমাজে নারী ভোগ্যপণ্য মাত্র

গৃহবধূ নাজমার বয়স ২৫ বছর। ওড়িশার ভদ্রক শহরে সে তার স্বামী শেখ শের মহম্মদ (ডাক নাম শেরু)-এর সঙ্গে বসবাস করত। তাদের ৪টি সন্তানও আছে। গত বছর (২০০৩ খ্রিঃ) জুলাই মাসের এক রাত্রে শেরু মাতাল অবস্থায় বাড়ি ফিরলে নাজমার সঙ্গে তার ঝগড়া ও কথা কাটাকাটি হয়। তখন রাগের মাথায় শেরু তিনবার 'তালাক' শব্দটি উচ্চারণ করে ফেলে। সকালে ঘুম থেকে উঠে শেরু কিছুই মনে করতে পারে না। কিন্তু পড়শীরা এসে বলে, 'তোমাদের তালাক হয়ে গিয়েছে, তাই তোমরা আর স্বামী-স্ত্রী হিসাবে একসঙ্গে থাকতে পারবে না। এক সঙ্গে থাকতে হলে তোমাদের 'হালালা' করতে হবে। এই হালালা হল তৃতীয় এক ব্যক্তির সঙ্গে নাজমার বিয়ে দিতে হবে এবং সেই ব্যক্তি তাকে তালাক দিলে শেরু আবার তাকে বিয়ে করতে পারবে। কিন্তু নাজমা তাতে রাজি না হওয়ায় গত ২৩ মে পাড়াপড়শীরা নাজমা ও তার চার সন্তানকে ঘর থেকে বার করে দেয়।

একটি সামাজিক সংগঠন (Society for Weaker Communities)-এর সভানেত্রী শ্রীমতী সফিয়া শেখ নাজমা ও তার চার সন্তানকে আশ্রয় দেয়। অনেক কট্টরবাদী মুসলিম সংস্থার পক্ষ থেকে শ্রীমতী সোফিয়াকে ভয় দেখানো হয়। কিন্তু তিনি তাতে কান না দিয়ে 'ন্যাশনাল কমিশন ফর উইমেন' নামক একটি সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ফলে ওই সংস্থার ৫ জনের একটি দল ঘটনার তদন্ত করতে যায়। ওই দলের একজন সদস্যা শ্রীমতী নম্রতা চাড্ঢা নাজমার সঙ্গে একান্তে সাক্ষাৎ করলে নাজমা তাকে বলে, 'হালালার নাম করে ওরা আমাকে পতিতাবৃত্তিতে নামিয়ে আনতে চায়।'

উপরিউক্ত তিন তালাক ও হালালার ব্যাপারে কোরান বলছে, 'দুবার তালাক দেবার পরে তাকে নিয়ম অনুযায়ী রাখতে পার অথবা সৎভাবে বিদায় দিতে পার.....' (২/২২৯)। 'অতঃপর সে যদি তাকে (স্ত্রীকে) তালাক দেয় তবে সে আর তার জন্য বৈধ (হালালা) হবে না, যে পর্যন্ত না অন্য এক ব্যক্তির সঙ্গে সে বিবাহিত হবে। তারপর সে (দ্বিতীয় স্বামী) যদি তাকে তালাক দেয় এবং যদি উভয়ে (স্ত্রী ও প্রাক্তন স্বামী) মনে করে যে তারা আল্লার সীমারেখা রক্ষা করতে সমর্থ হবে, তবে তাদের পুনর্মিলনে আর কোন অপরাধ হবে না' (২/২৩০)।

তালাক দেওয়া স্ত্রীকে হালালার মাধ্যমে পুনরায় গ্রহণ করার এটাই কোরানের চূড়ান্ত নির্দেশ। এই হালালা কার্যকর করতে মুসলমানরা রাস্তা থেকে অজানা অচেনা কদাকার এক ব্যক্তিকে ডেকে আনে। তার সঙ্গে চুক্তি থাকে যে, রাত্রে ওই স্ত্রীর সঙ্গে তার নিকা দেওয়া হবে এবং এক রাত্রি তার সঙ্গে কাটিয়ে ভোরবেলা সে তাকে তালাক দেবে। বদলে সে চুক্তি মাফিক পারিশ্রমিক নিয়ে বিদায় হবে।

আরবী শব্দ 'হালালা'-র অর্থ অবৈধকে বৈধ করা। আল্লার বিচারে যে স্ত্রী অবৈধ হয়ে গিয়েছিল, তাকে আবার বৈধ করাই হল হালালা। আর যে ব্যক্তি এক রাত্রির জন্য নিকা করে হালালা করে, তাকে বলা হয় মুহাল্লিল বা বৈধকারী। Sir W. Muir ওই ব্যক্তিকে বলেছেন মুস্তাহেল (mustahel)। যে ব্যক্তির স্ত্রীকে মুহাল্লিল হালালা করল তাকে বলা হয় 'মুহাল্লাল্লাহ' এবং পুরো ব্যাপারটাকে বলে 'তাহলিল'। এই ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে Sir W. Muir বলেছেন, "Many lovers or gallants cause less shame to a woman than one Mustahel" অর্থাৎ কোন মহিলার পক্ষে বহু প্রেমিক ও বীর নাগর থাকা একজন 'মুস্তাহেল থাকার চাইতে কম লজ্জাকর।' তিনি আরও বলেছেন, "It must not be forgotten that all the immorality of speech and action connected with this shameful institution and the outrage done to the female virtue, not necessarily for any fault of the wretched wife, but the passion and thoughtlessness of the husband himself, has solely arisen out of the verse (2/230) quoted above" (Life of Mahomet. Voice of India, P-337)".

অনেক পাঠক মনে করতে পারেন যে, মুহাল্লিলের সঙ্গে নিকা দিয়ে এক সঙ্গে রাত কাটাতে না দিলেই আর কোন ঝামেলা থাকে না। কিন্তু ইসলামী শাস্ত্র অনুসারে শুধু নিকা দিলেই হবে না, এক বিছানায় রাত কাটাতেও দিতে হবে। এই ব্যাপারে মুসলিম শরীফের ৩৩৫৪ নম্বর হাদিস বলছে—একদিন একজন তালাক প্রাপ্তা রমণী মহম্মদের কাছে এসে বলল যে, সে তার আগের স্বামীর কাছে ফিরে যেতে চায়।......শুনে মহম্মদ একটু হাসলেন এবং বললেন, 'না, তা তুমি পার না, যতক্ষণ না তোমার নতুন স্বামী তোমার মাধুর্য উপভোগ করছে এবং তুমি তার মাধুর্য উপভোগ করছ।'

মুসলিম সমাজে এমন ঘটনাও অনেক ঘটে, যেখানে কোন একজন বন্ধু বা আত্মীয়কে বিশ্বাসযোগ্য মনে করে মুহাল্লিল নিয়োগ করা হল, কিন্তু সে কথা রাখল না। তালাক না দিয়ে সে সেই মহিলাকে তৃতীয় বা চতুর্থ স্ত্রী হিসাবে বাড়ি

নিয়ে গেল। এসব ঘটনা অনেক ঘটলেও, সাধারণভাবে লোকচক্ষুর আড়ালেই তা থেকে যায়। যে দু'একটা ক্ষেত্রে মামলা-মোকদ্দমা হয়, সেগুলোই সাধারণ মানুষ জানতে পারে।

গত জুলাই মাসে কানপুরে অনুষ্ঠিত হল 'অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড' বা 'এ আই এম পি এল বি'-র কার্যকরী সমিতির অধিবেশন। মুসলিম মহিলা সমাজ ও কিছু সংখ্যক মুসলমান বুদ্ধিজীবী আশা করেছিলেন যে, কর্তাব্যক্তিরা তিন তালাকের ব্যাপারে কিছুটা উদার ও প্রগতিশীল মনোভাবের পরিচয় দেবেন। তিনবার 'তালাক' বলে গৃহপালিত পশুর মত স্ত্রীকে (কোনরকম খোরপোষ না দিয়েই) ঘর থেকে বিতাড়িত করার মত অমানবিক প্রথার বিরুদ্ধে মুসলিম মহিলা সমাজ অনেকদিন থেকেই প্রতিবাদ জানিয়ে আসছে। কিন্তু ৪২ সদস্য বিশিষ্ট 'এ আই এম পি এল বি'-র কার্যকরী সমিতি বিষয়টা নিয়ে কিছুটা আলোচনা করলেও কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া স্থগিত রাখে।

অনেকে ভেবেছিল যে, নিকাহনামার কোন মৌলিক পরিবর্তন না করলেও বোর্ডের কার্যকরী সমিতি নিকাহ নামার সঙ্গে হিদায়াৎ নামা নামে একটা সংশোধনী যুক্ত করবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে বোর্ড কোন রকম সংশোধনী কার্যকর করা থেকে বিরত থাকে। এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে বোর্ডের সদস্য জাফরিয়ার জিলানি বলেন, 'তিন তালাকের প্রথাকে রদ করার কোন উদ্দেশ্য বোর্ডের ছিল না। এ ব্যাপারে বোর্ডের উদ্দেশ্য হল মুসলিম সমাজকে শিক্ষিত করে তোলা।' বোর্ডের আর এক মাননীয়া সদস্যা বেগম ইফতাদার বলেন, নিকাহনামাকে সংশোধন করা বা হিদায়াৎনামা যুক্ত করার কোন উদ্দেশ্যই বোর্ডের ছিল না। তবে এটা ঠিক যে, হিদায়াৎনামা যুক্ত করা হলে তিন তালাকের অপপ্রয়োগ অনেক কম হবে।

এখানে বলে রাখা সঙ্গত হবে যে, ইসলামে বিবাহ একটা সামাজিক চুক্তি মাত্র। বিবাহের আগে এই চুক্তিপত্র লেখা হয়। যাকে নিকাহ্‌নামা বলে। নিকাহ্‌নামার মূল বিষয় বস্তু হল দেনমোহর (বা মোহর) নির্ধারণ করা। ইসলামী আইনে শুধু স্বামীরই অধিকার আছে স্ত্রীকে তালাক দেবার। এ ব্যাপারে জনাব এম হিদায়াতুল্লা-র 'প্রিন্সিপল্‌স্ অফ মহমেডান ল' (ত্রিপাঠী, ১৯৮০ , পৃঃ ৩২৪) বলছে, ''স্বামী তিনবার 'তালাক' শব্দ উচ্চারণ করলে সঙ্গে সঙ্গে স্থান কাল নির্বিশেষে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে এবং সেই মুহূর্ত থেকেই তা কার্যকরী হবে।''

আজকের বিজ্ঞানের যুগে, টেলিফোন মারফৎ স্ত্রীকে 'তালাক' শব্দ শোনালেও সঙ্গে সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়। শুধু তা-ই নয়, উপরিউক্ত 'ইসলামিক পার্সোনাল ল' বোর্ডের নিয়ম অনুসারে স্বামী যদি একটি পোস্ট কার্ডে তিনবার তালাক লিখে পাঠায় তবে সেই পোস্ট কার্ড স্ত্রীর হাতে পৌছানো মাত্র বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবে।

যাই হোক, এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে 'এ আই এম পি এল বি'-র সেক্রেটারি সৈয়দ নিজামুদ্দিন বলেন, 'ভবিষ্যতে নিকাহ্‌নামায় দার-উল-কাজা বা কাজির হস্তক্ষেপ-এর বিধান রাখা যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মতানৈক্য হলে কোন একজন কাজিকে মধ্যস্থতাকারী নিযুক্ত করার ব্যবস্থা থাকবে।' তিনি আরও বলেন যে, গুজরাট, অন্ধ্রপ্রদেশ, রাজস্থান, তামিলনাড়ু ও উত্তরপ্রদেশে এবং আরও কিছু রাজ্যে দার-উল-কাজা ইতিমধ্যে চালু করা হয়েছে। তা ছাড়া অনেক রাজ্যে চালু করা হয়েছে তালাক-এ সুন্নৎ, যার ফলে একই সঙ্গে তিনবার তালাক বললে বিবাহ বিচ্ছেদ হবে না। প্রতিমাসে একবার করে তিন মাসে তিনবার তালাক বললে তবেই বিবাহ বিচ্ছেদ হবে। তবে এ সব কথা শুধু মুখের কথা মাত্র এবং কার্যক্ষেত্রে এসবের কোন ভূমিকা নেই বললেই চলে। সৈয়দ নিজামুদ্দিন আরও বলেন যে, শিয়া-সুন্নী ছাড়াও মুসলমানদের মধ্যে নানান দল উপদল রয়েছে। তাই তালাকের মত একটা বিতর্কিত বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া খুবই অসুবিধাজনক।

প্রখ্যাত মুসলমান বুদ্ধিজীবী আসগর আলি ইঞ্জিনিয়ার একটি প্রবন্ধে (Islamic Voice—July, 2004) বলেন, "এই বিশ্বে একমাত্র ইসলামই সর্ব প্রথম নারী জাতিকে পুরুষের সমান অধিকার দিয়েছে এবং কোরান সর্বপ্রথম নারী ও পুরুষের ভেদাভেদকে অস্বীকার করেছে।" প্রত্যেক মুসলমান বুদ্ধিজীবীকেই এইসব কথা বলতে হয়, কারণ তা না হলে তাঁর গর্দানের বিপদ দেখা দেবে। সেই একই কারণে কলকাতার লেখক জনাব রফিকুল্লাহ্ বলেন, 'প্রকৃতপক্ষে নারী জাতিকে মর্যাদাদানই হল হজরৎ মহম্মদের সংস্কারমূলক কর্মগুলির অন্যতম।' কিন্তু যে কেউ ইসলামি শাস্ত্র কিছুটা অধ্যয়ন করলেই দেখতে পাবেন যে, নারী জাতিকে মর্যাদা দানের ব্যাপারে আল্লা ঘোরতর অনিচ্ছুক। কাজেই সেই অনিচ্ছুক আল্লাকে অতিক্রম করে এ কাজে মহম্মদ যে খুবই কম কৃতকার্য হবেন তাতে আর আশ্চর্য কি। মুসলিম সমাজে নারীর স্থান কোথায় তা বুঝতে অসুবিধা হয় না যখন দেখা

যায় যে মুসলিম দেশগুলোতে দুইজন নারীর সাক্ষ্য একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান হিসাবে আদালতে গ্রাহ্য হয়। কোন নারী ধর্ষিতা হলে দু'জন পুরুষ সাক্ষী উপস্থিত করতে হয়। অন্যথায় সে নারী পরপুরুষগামিনীর অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হয়। যার শাস্তি হল, কোমর পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে দিয়ে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলা। যে সমাজে মেয়েদের বোরখায় ঢেকে রাখা হয় ও গৃহে অন্তরীণ করে রাখা হয়, সে সমাজে নারীর স্থান কোথায় তা আর বুঝিয়ে বলার দরকার হয় না।

মুসলিম সমাজে নারীজাতি কতখানি সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিতা তা খুব ভালভাবে ফুটে ওঠে, যখন আল্লা বলেন, 'পুরুষ নারীর কর্তা, কারণ আল্লা এককে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, আর এ শ্রেষ্ঠত্ব এজন্য যে, পুরুষ নারীর (ভরণপোষণের) জন্য টাকা খরচ করে। কাজেই সাধ্বী নারী লোকচক্ষুর অন্তরালে আনুগত্য ও ইজ্জৎ রক্ষাকারিণী।.....স্ত্রীদের মধ্যে যাদের অবাধ্যতার আশঙ্কা কর প্রথমে তাদের সদুপদেশ দাও, তারপর তাদের শয্যা ত্যাগ কর এবং প্রহার কর' (কোরান ৪/৩৪)।

টাকা খরচ করে একজন পুরুষ অনেক কিছুর ওপরই অধিকার অর্জন করতে পারে, যেমন স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি, দাসী, রক্ষিতা, বারবণিতা, গৃহপালিত পশু ও অন্যান্য ভোগের সামগ্রী। কাজেই কোরান অনুসারে মুসলিম সমাজে নারীর স্থান এসবের থেকে মর্যাদা সম্পন্ন কিনা তা সুধীজনের বিচার্য। উপরন্তু, বহু বিবাহ ও তিনবার তালাক বলে যে কোন স্ত্রীকে বিতাড়িত করার অধিকার পুরুষের হাতে তুলে দিয়ে ইসলাম নারীকে পুরুষের লালসা চরিতার্থ করার একটি ভোগ্যপণ্যে পর্যবসিত করেছে কিনা, সেটাও সুধীজনের বিচার্য।

এর থেকেও বড় কথা হল, 'এ আই এম পি এল বি'-র পক্ষে ইসলামী বিবাহ আইন পরিবর্তনের অক্ষমতা এটাই প্রমাণ করে যে, নিজেকে যুগোপযোগী করে নেবার ক্ষমতা মুসলিম সমাজের নেই। তাই বলা যেতে পারে, এই কারণেই ইসলাম পৃথিবীর মাটি থেকে লুপ্ত হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে হিন্দু বা সনাতন ধর্ম টিকে থাকবে কারণ নিজেকে যুগের উপযুক্ত করে নেবার ক্ষমতা হিন্দু ধর্মের আছে।

পরিশিষ্ট - ৬

মুসলিম সমাজের ক্ষণস্থায়ী বিবাহ

এবছর মে মাসে মহম্মদ জাফের ইয়াকুব হাসান আল জোরানি নামে ৭৩ বছরের বৃদ্ধ এক মুসলমান চোখের অপারেশন করাতে শারজা থেকে অন্ধ্রপ্রদেশের রাজধানী হায়দ্রাবাদে আসে। গত ৭ মে সে হাসিনা বেগম নামে ১৯ বছরের এক কিশোরীকে বিয়ে করে। মাত্র দুদিন পরে সে হাসিনাকে তালাক দিয়ে দেয়। তারপর ২৪ মে সে রুকসানা বেগম নামে ১৬ বছরের আর একটি কিশোরীকে বিয়ে করে। সমস্ত রকমের ভয়ভীতি উপেক্ষা করে হাসিনা থানায় গিয়ে পুলিশকে সব জানায়। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে পুলিশ জোরানিকে গ্রেপ্তার করে। সেই সঙ্গে পুলিশ শামসুদ্দিন নামে এক জন দালালকেও গ্রেপ্তার করে। পুলিশ জানতে পারে যে শামসুদ্দিনই হাসিনা ও জোরানির বিয়ের মধ্যস্থতা করেছিল এবং বিয়ের মোহর হিসাবে জোরানি হাসিনার বাবাকে ৪০ হাজার টাকা দিয়েছিল। এখানে বলে রাখা উচিত হবে যে, শারজার বাড়িতে জোরানির ২জন বিবি ও ১১টি ছেলেমেয়ে রয়েছে।

অনুসন্ধানের ফলে পুলিশ জানতে পারে যে, ২৪ মে রুকসানাকে বিয়ে করার কয়েকদিন পর জোরানি তাকেও তালাক দিয়ে তৃতীয়বার একটি কিশোরীকে বিয়ে করে। কিন্তু রুকসানা ও তৃতীয় সেই কিশোরীটি পুলিশকে কিছু না জানানোর ফলে তাদের ব্যাপারে পুলিশের কিছু করা সম্ভব হয়নি। দালাল শামসুদ্দিনকে জেরা করে পুলিশ আরও বেশ কয়েকজন দালালের হদিস পায় এবং তাদেরও গ্রেপ্তার করে। এদের কাছ থেকে পুলিশ জানতে পারে যে, অপরাধ জগতের এক বিরাট চক্র হায়দ্রাবাদে এই রমরমা কারবার চালিয়ে যাচ্ছে। পুলিশ আরও জানতে পারে যে, এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে মুসলিম কাজিদের একটি চক্র। এই কাজিরাই শাঁসালো পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ধনী আরবদের সঙ্গে নাবালিকা ও কিশোরীদের ইসলামী নিয়ম মতে বিয়েশাদী করিয়ে দেয়। আহম্মদ শরিফ নামে এক কাজিকেও পুলিশ গ্রেপ্তার করে। এই কাজিই হাসিনা ও জোরানির বিয়ে দিয়েছিল। শামসুদ্দিনকে জেরা করে পুলিশ জানতে পারে যে, সে এক প্রধান কাজির সাহায্যকারী মাত্র এবং সেই প্রধান কাজির মোট জনাকুড়ি সাহায্যকারী আছে।

হায়দ্রাবাদের রাজীব গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর থেকে শুরু হয় এইসব চক্রের কাজ। দুবাই ও শারজা থেকে ধনী আরবেরা এখানেই এসে নামে এবং

তাদের পিছনে তখনই দালালরা লেগে পড়ে। দরদাম ঠিক হয়। তারপর কাজিদের মাধ্যমে ভারতীয় নাবালিকা ও কিশোরীদের সঙ্গে ধনী আরবদের ক্ষণস্থায়ী বিবাহ বা মুতা সম্পন্ন হয়। এই সব ক্ষণস্থায়ী বিবাহ কয়েকদিন বা বড়জোর কয়েক সপ্তাহ স্থায়ী হয়। পুলিশের অনুমান, প্রতি মাসে হায়দ্রাবাদে এরকম ৩৫ থেকে ৪০টা ক্ষণস্থায়ী বিবাহ হয়। অনেক আরব আবার তার বিয়ে করা বিবিকে দেশে নিয়ে যায় এবং সেখানে তাদের দাসীবৃত্তি করে বাকি জীবনটা কাটাতে হয়। এসব ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে হায়দ্রাবাদ পুলিশের অ্যাডিশনাল কমিশনার এ কে খাঁ বলেন, "আইনের সাহায্যে এইসব কাজ কারবার বন্ধ করা মুশকিল। আমাদের পক্ষে যা সম্ভব তা হল আরবের ওই সব ধনকুবেরদের ওপর নজর রাখা এবং এভাবে তাদের অন্যায় কাজকর্মকে সীমিত রাখার চেষ্টা করা।'

শ্রী খাঁ সাহেবের উপরিউক্ত মন্তব্যের সারমর্ম হল, ওইসব আরব ধনকুবের ও হতভাগ্য ভারতীয় কিশোরীদের ক্ষণস্থায়ী বিবাহ কোরান এবং ইসলামী আইন বা শরিয়াহ্ অনুসারেই হয়। উপরন্তু ইসলামে পুরুষের বহু বিবাহ স্বীকৃত। তাই সেই দিক দিয়ে পুলিশের কিছু করার থাকে না। শুধু সেই কিশোরী যদি নাবালিকা হয় তবে ভারতীয় দণ্ডবিধি প্রয়োগ করা পুলিশের পক্ষে সম্ভব হয়।

ইসলামে বিবাহ একটি সামাজিক চুক্তি মাত্র। বিবাহের আগে এই চুক্তিপত্র লেখা হয়। যাকে 'নিকাহ্নামা' বলে। নিকাহ্নামার মূল বিষয়বস্তু হল, দেনমোহর (বা মোহর) নির্ধারণ করা। ইসলামী আইনে স্বামীরই অধিকার আছে স্ত্রীকে তালাক দেবার। জনাব এম হিদায়াতুল্লা সাহেবের 'প্রিন্সিপাল্স্ অফ মহামেডান ল' (ত্রিপাঠী, ১৯৮০, ৩২৪ পৃষ্ঠা) বলছে যে, "স্বামী তিনবার 'তালাক' শব্দ উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে, স্থান-কাল নির্বিশেষে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায় এবং সেই মুহূর্ত থেকেই তা কার্যকরী হয়।" এব্যাপারে কোরান বলছে, "তালাক দুবার, পরে তাকে (স্ত্রীকে) নিয়ম অনুযায়ী রাখতে পার অথবা সৎভাবে বিদায় দিতে পারো। অতঃপর সে (স্বামী) যদি তাকে তালাক দেয় তবে সে (স্ত্রী) আর তার জন্য বৈধ হবে না। যে পর্যন্ত অন্য এক ব্যক্তির সঙ্গে তার বিয়ে হচ্ছে। তারপর সে (দ্বিতীয় স্বামী) তাকে যদি তালাক দেয় এবং যদি উভয়ে মনে করে যে তারা আল্লার সীমারেখা রক্ষা করতে সমর্থ হবে তবে তাদের পুনর্মিলনে আর কোন অপরাধ হবে না।" (ডঃ ওসমান গনী অনুবাদিত কোরান, ২/২২৯-২৩০)।

কাজেই কোরান অনুসারে স্বামীর অধিকার আছে তিনবার তালাক বলে স্ত্রীকে ঘর

থেকে বিদায় করার। সেই অবস্থায় স্বামী সেই তালাক দেওয়া পত্নীকে কিছু টাকা পয়সা দিতে বাধ্য থাকে, যাকে মোহর বলে এবং নিকাহ্‌নামায় এই মোহরের পরিমাণ উল্লেখ করতে হয়। স্বভাবতই কন্যাপক্ষ চায় মোহরের পরিমাণ বাড়িয়ে নিতে এবং বরপক্ষ চায় তা যথাসম্ভব কমিয়ে আনতে। শেষপর্যন্ত মাঝামাঝি কোথাও রফা হয়।

যাই হোক, এ ব্যাপারে লক্ষ্য করার বিষয় হল, যে মুহূর্তে স্বামী তিনবার তালাক বলে স্ত্রীকে তালাক দেবে, সেই মুহূর্তে বিবাহচুক্তি বা নিকাহ্‌নামাও বাতিল হয়ে যাবে। এ নিয়ম শুধু নিকাহ্-র ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কিন্তু ক্ষণস্থায়ী বিবাহ বা মুতা-র ক্ষেত্রে বিবাহ চুক্তিটাই ক্ষণস্থায়ী এবং কয়েক ঘন্টা, কয়েকদিন বা কয়েক সপ্তাহ পরে বিবাহ চুক্তিটা আপনা থেকেই বাতিল হয়ে যাবে। সেই সঙ্গে হবে বিবাহ বিচ্ছেদ। এবং এজন্য স্বামীর তালাক দেবার আর প্রয়োজন থাকবে না। তবে তারও আগে তালাক চাইলে স্বামীকে প্রথা মাফিক তালাক দিতে হবে।

এই মুতা-র ব্যাপারে কোরান বলছে, "হে বিশ্বাসীগণ, যে সমস্ত উত্তম বস্তু আল্লা তোমাদের জন্য বৈধ করেছেন তা তোমরা অবৈধ করো না, কিন্তু সীমালঙ্ঘন করো না, নিশ্চয়ই আল্লা সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না" (৫।৮৭)। কিন্তু শুধু এই খাপছাড়া আয়াতটি পড়ে বোঝার সাধ্য নেই যে এখানে উত্তম বস্তুই বা কি এবং সেই বৈধ উত্তম বস্তুকে অবৈধ করা এবং সীমা লঙ্ঘন না করার মধ্যে দিয়ে আল্লা কি বলতে চাইছেন। মুসলিম শরীফের ৩২৪৩ নম্বর হাদিসটি পড়লে ব্যাপারটা বোঝা যাবে।

যুদ্ধাভিযান বা জিহাদকালে স্বভাবতই স্ত্রীলোকের অভাবজনিত কারণে আল্লার প্রিয়তম বান্দারা কষ্ট পায়। তাই পরম দয়াময় দয়ালু (রহমানির রহিম) আল্লা উপরিউক্ত আয়াতের মাধ্যমে স্থানীয় রমণীদের সঙ্গে আল্লার বান্দাদের অস্থায়ী বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন করা বৈধ করে দিচ্ছেন। কিন্তু যে কোন বিবাহের ক্ষেত্রেই আল্লা মোহর প্রদানকে আবশ্যিক করেছেন। কাজেই এক্ষেত্রেও মোহর না দিয়ে আল্লা তাঁর সীমালঙ্ঘন করতে নিষেধ করছেন। তাই এবার বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, উল্লিখিত (৫।৮৭) আয়াতে আল্লা বৈধকর্ম বলতে স্থানীয় মহিলাদের সঙ্গে অস্থায়ী বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন করাকে, উত্তম বস্তু বলতে স্থানীয় রমণীদের এবং সীমালঙ্ঘন করা বলতে মোহর না দেওয়াকে বোঝাতে চাইছেন। সময় বিশেষে এক মুষ্ঠি ময়দা, কিছু খেজুর অথবা গায়ের জামাটাও মোহর হিসাবে চলতে পারে। সুতরাং ইসলামের দৃষ্টিতে আরবের ধনকুবের হাসান আল জোরানি

ভারতীয় কিশোরী হাসিনা বেগমের বাবাকে ৪০ হাজার টাকা মোহর দিয়ে হাসিনার সঙ্গে ক্ষণস্থায়ী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে কোন অন্যায় করেনি। বরং সে আল্লা নির্দিষ্ট বৈধ কর্মই করেছে। মেয়েটি নাবালিকা না সাবালিকা, সে ব্যপারে আল্লার কোন নির্দেশ নেই। এ ব্যাপারে স্মরণ করা যেতে পারে যে, নবী হজরত মহম্মদ তাঁর ৫২ বছর বয়সে ৬ বছরের শিশু আয়েষাকে নিকাহ্ করেছিলেন। কিন্তু বর্তমান সভ্য জগতের আইন অনুসারে কেউ কোন নাবালিকাকে বিবাহ করলে সে ধর্ষণের অপরাধে অপরাধী বিবেচিত হবে। আর কোরান নির্দিষ্ট ক্ষণস্থায়ী বিবাহ বিবেচিত হবে পতিতাবৃত্তি হিসাবে।

সুতরাং বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, আরবের ধনকুবেরদের হায়দ্রাবাদে এসে ভারতীয় নাবালিকাদের ক্ষণস্থায়ী বিবাহ বা মুতা করা এবং তাদের সঙ্গে ওঠাবসা করা বর্তমান সভ্য সমাজের আইনে নারীত্বের পণ্যায়ন (পতিতাবৃত্তি) এবং যৌন অত্যাচার ছাড়া আর কিছুই নয়। হায়দ্রাবাদে এইসব অপরাধের সূচনা হয় আজ থেকে ১৪ বছর আগে। গত ১৯৯১ সালে ১১ বছর বয়সী আমিনা নামের একটি কিশোরীকে বলপূর্বক আরবের এক ধনকুবের বৃদ্ধের সঙ্গে ক্ষণস্থায়ী বিবাহ দেওয়া হয়। খবরটা জানাজানি হয়ে যাবার ফলে কিছুটা সোরগোলের সৃষ্টি হয় বটে, তবে সেই সোরগোল থেমে গেলে হায়দ্রাবাদের মেয়ে বাজারের ব্যবসা রমরমিয়ে চলতে থাকে। এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে দিয়ে কনফেডারেশন অফ ভলান্টারি এজেন্সিজ' নামক একটি সামাজিক সংস্থা (এন জি ও)-র অধিকর্তা জনাব মাঝার হোসেন বলেন, "এইসব (ক্ষণস্থায়ী) বিবাহ ছোট ছোট মেয়েদের পতিতায় পরিণত করছে।"

যে কোন সভ্য সমাজেই ইসলামের ক্ষণস্থায়ী বিবাহ বা মুতা যে পতিতাবৃত্তি অথবা ধর্ষণ বলে গণ্য হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে একজন বয়স্কা মহিলা ও একজন নাবালিকাকে ধর্ষণের মধ্যে অবশ্যই আইনগত প্রভেদ থাকা উচিত। দুঃখের বিষয়, ভারতীয় ফৌজদারি দন্ডবিধির ৩৭৫ ধারায় ধর্ষণের যে সংজ্ঞা দেওয়া আছে তাতে নাবালিকা বা সাবালিকাকে ধর্ষণের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয় নি। অনেকের মতে, নাবালিকা ধর্ষণের মতো অপরাধকে মোকাবিলা করার জন্য আরও আইন ও প্রাণদণ্ডের মতো চরম শাস্তির বিধান থাকা উচিৎ। মানে আইন আরও কঠোর হলে হায়দ্রাবাদের নাবালিকারা আরবের ধনকুবেরদের যৌন স্বেচ্ছাচারিতার হাত থেকে কিছুটা রেহাই পাবে।